বাজারের কথা

৯·১· বাজার কাকে বলে ?

সাধারণ কথায় বাজার বলতে একটি স্থানকে বোঝায় যে স্থানে বহুসংখ্যক বিক্রেতা বহুপ্রকার দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য নিয়ে আসে এবং যেখানে অসংখ্য ক্রেতা সেইসব দ্রব্য ক্রয় করে। অর্থনীতির বাজারের ধারণা এই সাধারণ বাজার থেকে কিছুটা পৃথক। **প্রথমত,** এখানে বাজার বলতে বোঝায় **একটি মাত্র দ্রব্যের বাজার**। যেমন, চালের বাজার, গমের বাজার, কিংবা কাপড়ের বাজার ইত্যাদি। **দ্বিতীয়ত,** অর্থনীতির বাজার হল একটি দ্রব্যের জন্য সকল ক্রেতার চাহিদা ও সকল বিক্রেতার যোগানের মধ্যে সঙ্গতি নির্ণয় অথবা ক্রেতাদের ও বিক্রেতাদের মধ্যে বিনিময়। ক্রেতারা বাজারে দ্রব্য ক্রয় করার জন্য অর্থ নিয়ে যায়। বিক্রেতারা নিয়ে আসে দ্রব্য। ক্রেতাদের আছে অর্থের যোগান ও দ্রব্যের চাহিদা এবং বিক্রেতাদের আছে দ্রব্যের যোগান ও অর্থের চাহিদা। **বাজারে এই উভয় পার্শ্বিক চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়।** **তৃতীয়ত,** বাজার যে সব সময় কোন একটি স্থানের মধ্যে বদ্ধ হবে এমন কোন কথা নেই। **বাজার হল একটি পরিবেশ, যে পরিবেশের মধ্যে ক্রেতাদের ও বিক্রেতাদের মধ্যে মিলন ঘটে**। অনেক সময় ক্রেতারা বিক্রেতাদের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করে এবং এইভাবে দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হয়। একেও আমরা একটি বাজার বলতে পারি। অতএব অর্থনীতিতে বাজার বলতে বোঝায় একটি পরিবেশ, যে পরিবেশের মধ্যে কোন একটি দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় ঘটে অর্থাৎ যে পরিবেশে একটি দ্রব্যের ক্রেতাদের সঙ্গে সেই দ্রব্যের বিক্রেতাদের বিনিময় ঘটে।

৯·২· বাজারের কাজ ঃ

বাজারের প্রধান কাজ হল দুটি। **প্রথমত, বাজার ক্রেতাদের ও বিক্রেতাদের মধ্যে মিলন ঘটায়**। ক্রেতা দ্রব্য ক্রয় করে ভোগ করতে চায়, বিক্রেতা দ্রব্য উৎপাদন করে বিক্রয় করতে চায়। ক্রেতা অর্থ দেয় এবং বিনিময়ে দ্রব্য পায়। বিক্রেতা দ্রব্য দেয় এবং বিনিময়ে অর্থ পায়। এই অর্থ দিয়ে বিক্রেতা আবার অন্য দ্রব্য ক্রয় করে। তখন বিক্রেতা ক্রেতায় পরিণত হয়। আবার ক্রেতা যে অর্থ নিয়ে বাজারে আসে সেই অর্থ তার আয়ের অংশ। সে সেই আয় পেয়েছে কোন না কোন দ্রব্য বা সেবার যোগান দিয়ে। অতএব **এক বাজারের ক্রেতা অন্য কোন বাজারের বিক্রেতা**। তাহলে দেখা যাচ্ছে, সকলেই ক্রেতা ও বিক্রেতা। এমনটা কেন হয় ? খুব সংক্ষেপে বলা যায়—কোন মানুষের জীবনধারণের জন্য বহু রকমের দ্রব্য ও সেবার প্রয়োজন। এই দ্রব্য ও সেবার সব কয়টি উৎপাদন করা কোন একজন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় ; সম্ভব হলেও লাভজনক নয়। কাজেই সে একটি বা দুটি বা কয়েকটি মাত্র দ্রব্য বা সেবার যোগান দেয়। তা থেকে সে যে অর্থ পায় তাই দিয়ে অন্য সব দ্রব্য বা সেবা ক্রয় করে নেয়। মার্ক্সের মতে এটা হল **দ্রব্য→অর্থ→দ্রব্য চক্র**। কোন একজন ব্যক্তি দ্রব্য উৎপাদন করে বাজারে নিয়ে যায়, সেখানে সেই দ্রব্য বিক্রয় করে সে অর্থ পায়। সেই অর্থ নিয়ে সে আবার অন্য বাজারে যায়। এবার যায় ক্রেতা হিসেবে এবং সেই অর্থ দিয়ে অন্য দ্রব্য ক্রয় করে। অতএব **দ্রব্য→অর্থ→দ্রব্য চক্রের** বাম বাহুতে ব্যক্তি থাকে বিক্রেতা হিসেবে এবং এর দক্ষিণ বাহুতে ব্যক্তি থাকে ক্রেতা হিসেবে।

এই চক্রের বামদিকে বিক্রয় এবং দক্ষিণদিকে ক্রয়। তাহলে এই চক্রের শরীর হল বাজার। কারণ নিছক ক্রয় বা নিছক বিক্রয় বলে কিছু থাকে না। একজনের বিক্রয় হল অন্যজনের ক্রয়

এবং একজনের ক্রয় হল অন্যজনের বিক্রয়। বাজারের কাজ হল ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে মিলন ঘটানো।

অন্যভাবে বলা যায়—**বাজার ভোগ ও উৎপাদনের ব্যবধান দূর করে**। একজন ব্যক্তি দ্রব্য উৎপাদন করে কিন্তু সেই ব্যক্তি সেই দ্রব্যের সবটা ভোগ করে না। আবার যে ভোগ করে সে সেই দ্রব্য উৎপাদন করে না। আমরা লেবু খাই, কিন্তু লেবু উৎপাদন করি না। জেলেরা যে মাছ উৎপাদন করে তার সবটা তারা ভোগ করে না। এখানে ভোগ ও উৎপাদনের মধ্যে ব্যক্তিগত ব্যবধান লক্ষ্য করা যায়। বাজার এই ব্যবধান দূর করে। জেলেরা মাছ উৎপাদন করে বাজারে নিয়ে যায়। ক্রেতারা বাজারে গিয়ে সেই মাছ ক্রয় করে আনে। বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতার মিলন ঘটে এবং ভোগ ও উৎপাদনের মধ্যে ব্যক্তিগত ব্যবধান দূর হয়।

ভোগ ও উৎপাদনের মধ্যে ব্যক্তিগত ব্যবধান ছাড়াও সাময়িক ও স্থানগত ব্যবধান থাকতে পারে। যেমন, আখ উৎপাদন হয় বছরের একটি মরসুমে, কিন্তু চিনি সারা বছর ধরে ব্যবহৃত হয়। আলু বছরের একটি সময়ে উৎপন্ন হয়, কিন্তু সারা বছর ধরে আলু খাওয়া হয়।এইভাবে ভোগ ও উৎপাদনের মধ্যে সময়গত ব্যবধান থাকতে পারে। বাজার সেই ব্যবধান দূর করে। ভোগ ও উৎপাদনের মধ্যে স্থানগত ব্যবধানও থাকতে পারে। আসামে চা হয়, কিন্তু সেই চা সারাদেশে ভোগ করা হয়। বাজারের মাধ্যমে ভোগ ও উৎপাদনের মধ্যে এই স্থানগত পার্থক্য দূর হয়।

বাজারের **দ্বিতীয় কাজ হল**—ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে **বিনিময়ের মাধ্যমে দ্রব্যের দাম বা বিনিময় হার নির্ধারিত করা**। ক্রেতারা যে দামে দ্রব্য ক্রয় করতে চাইবে, বিক্রেতারা সেই দামে যদি দ্রব্যটি বিক্রয় করতে রাজি হয়ে যায় তাহলে বিনিময় ক্রিয়াটি সংঘটিত হয়। ক্রেতাদের অর্থের সঙ্গে বিক্রেতাদের দ্রব্যের বিনিময় হলে বিনিময়ের হারও নির্ধারিত হয়ে যায়। যদি ক্রেতারা যে দাম দিতে চায় সেই দাম বিক্রেতাদের হিসেবে কম হয়, তাহলে বিনিময় হবে না। আবার বিক্রেতারা যে দাম চাইবে, তা যদি ক্রেতাদের কাছে খুব বেশি বলে মনে হয়, তা হলেও বিনিময় হবে না। বিনিময় না হলে দ্রব্যের দামও নির্ধারিত হতে পারে না। বাজার একদিকে ক্রেতার ও বিক্রেতার মধ্যে বিনিময় সম্ভব করে, অপরদিকে বিনিময়ের দ্রব্য দুটির মধ্যে (বা অর্থ ও দ্রব্যের মধ্যে) বিনিময়ের হার নির্ধারিত করে।

৯·৩· বাজারের শ্রেণীবিভাগ ঃ

অর্থনীতিতে যে বাজারের কথা বলা হয়, সেই বাজার অনেকটা কাল্পনিক বা আদর্শ বাজার। আদর্শ বাজার হল বাস্তব বাজারের প্রতিচ্ছবি। আসল বাজারকে আলোচনার আয়নায় ফেলে দেখলে যেরকম দেখায়, অর্থনীতির বাজার সেইরকম বাজার। এখন আলোচনার সুবিধার জন্য বাজারের বিভিন্ন অবস্থার কথা ভাবা হয় এবং অবস্থা অনুযায়ী এক এক বাজারের এক এক রকম নাম দেওয়া হয়। বাজার বলতে যেহেতু ক্রয় ও বিক্রয়ের একটি পরিবেশ বোঝায়, কাজেই বাজারের শ্রেণী-বিভাগের প্রধান বিবেচ্য বিষয় হল ক্রেতা ও বিক্রেতার সংখ্যা ; কিংবা অন্যভাবে বললে মূল বিষয় হল চাহিদা ও যোগান সম্পর্কিত বিভিন্ন অবস্থা। ক্রয়ের দিকে আছে দ্রব্যের জন্য ক্রেতাদের চাহিদা ও তার দাম-গত স্থিতিস্থাপকতা এবং বিক্রয়ের দিকে আছে দ্রব্যের যোগান ও তার দাম-গত স্থিতিস্থাপকতা। আবার দ্রব্যের যোগান ও তার স্থিতিস্থাপকতা নির্ভর করে বিক্রেতাদের সংখ্যার উপর। তাহলে আমরা বলতে পারি—যোগানের দিক দিয়ে দেখলে বিক্রেতাদের সংখ্যার সাহায্যে বাজারের শ্রেণীবিভাগ করা যায়। বিক্রেতাদের সংখ্যা (ক) বহু (খ) এক অথবা (গ) একাধিক কিন্তু অসংখ্য না হয়ে সীমিত হতে পারে। তদনুযায়ী তিন ধরনের বাজারের উদ্ভব ঘটতে পারে। অর্থাৎ অর্থনীতিতে বাজার তিন রকমের হতে

পারে ঃ

১। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার ঃ এই বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা খুব বেশি থাকে এবং বিক্রেতাদের মধ্যে দ্রব্য বিক্রয় করার জন্য তীব্র প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করা যায় ;

২। একচেটিয়া বাজার ঃ এই বাজারে একজন মাত্র বিক্রেতা থাকে ; এখানে প্রতিযোগিতার প্রশ্নই ওঠে না ;

৩। অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতামূলক বাজার ঃ এই বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা বহু নয়, আবার একজনও নয়। এখানে কয়েকজন মাত্র বিক্রেতা থাকে এবং তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকে। এই বাজারে এক একজন বিক্রেতা খুবই ক্ষমতাশালী, বলতে গেলে প্রায় একচেটিয়া কারবারীর মত এবং এখানে সেরকম প্রায় একচেটিয়া ক্ষমতার অধিকারী বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকে বলে অনেকে এই বাজারকে একচেটিয়া প্রভাব-মিশ্রিত প্রতিযোগিতামূলক বাজার, বা, সংক্ষেপে একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজার বলে থাকেন। এই বাজারটি প্রতিযোগিতামূলক বাজার ও একচেটিয়া বাজারের এক মিশ্র-রূপ, কিংবা, একটি মধ্যবর্তী অবস্থা।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, প্রতিযোগিতামূলক ও একচেটিয়া বাজার উভয়েই সীমান্তবর্তী অবস্থা। বিক্রেতার সংখ্যা সম্বন্ধে আমরা যে ধারণা করতে পারি সেই ধারণার দুটি প্রান্ত বা সীমা থাকবে—উর্ধ্বসীমায় বিক্রেতাদের সংখ্যা বহু হতে পারে, এবং নিম্নসীমায় বিক্রেতার সংখ্যা মাত্র একজন হতে পারে। এই দুটি বাজারই অনেকাংশে বেশি কাল্পনিক বাজার। আমরা বাস্তবে যেসব বাজার দেখি সেগুলি এই দুটি সীমার মধ্যে থাকে। এখানে বিক্রেতাদের সংখ্যা বহুও নয়, আবার একও নয়। এখানে দেখা যায় মাত্র কয়েকজন উৎপাদক বা বিক্রেতা কোন দ্রব্য উৎপাদন বা বিক্রয় করে থাকে। কাজেই বাস্তব বাজারকে আমরা অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতামূলক বাজার বা একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলতে পারি।

৩। (ক) আবার অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের উপবিভাগও করা যায়। এখানে বিক্রেতাদের সংখ্যা যদি দুই হয় তাহলে সেই বাজারকে ডুয়োপলি বলা হয়। ৩ (খ) বিক্রেতাদের সংখ্যা যদি মুষ্টিমেয় কয়েকটি মাত্র হয় তাহলে সেই বাজারকে অলিগোপলি বলা হয়।

অতএব বাজারকে নিম্নলিখিত শ্রেণীগুলির মধ্যে রাখা যায় ঃ

১। পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতামূলক বাজার (যেখানে বিক্রেতা অসংখ্য) ; ২। একচেটিয়া বাজার (যেখানে একজন মাত্র বিক্রেতা) এবং ৩। অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতামূলক বাজার (যেখানে মাত্র কয়েকজন বিক্রেতা থাকে)। অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের মধ্যে পড়ে ঃ (ক) একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার, (খ) ডুয়োপলি, এবং (গ) অলিগোপলি (ঘ) অন্যান্য বাজার।

আমাদের পাঠ্যপুস্তকে বাজারকে দুটি বড়ো ভাগে রাখা হয়েছে—যথা, পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার ও অপূর্ণাঙ্গ বা অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার। অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারের মধ্যেই রাখা হয়েছে একচেটিয়া বাজার, একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার, ডুয়োপলি ও অলিগোপলি।

চাহিদা ও যোগানের মূলকথা
(Basics of Demand and Supply)

Demand is deficient when supply is excess. — Alfred Marshall

অধ্যায়ের বিষয়বস্তু ও জিজ্ঞাসা

এই অধ্যায়ে আমরা 'চাহিদা' শব্দটির অর্থ ও চাহিদারেখার বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করব— যেমন কোন দ্রব্যের চাহিদা কি কি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে, চাহিদার নিয়ম কি, কেন নিয়মটি কাজ করে, অর্থাৎ কেন চাহিদা রেখা বাঁদিক থেকে ডানদিকে নিম্নমুখী হয়, চাহিদারেখা কখন ও কিভাবে স্থান পরিবর্তন করে, ইত্যাদি।

চাহিদার নিয়মের মত যোগানেরও একটি নিয়ম আছে। এই নিয়মটির কয়েকটি ব্যতিক্রমও আছে। আবার যোগানের নিয়ম থেকে উদ্ভূত হয় যোগানের স্থিতিস্থাপকতার ধারণাটি। এই অধ্যায়ে যোগানের নিয়ম, যোগান অপেক্ষক, যোগানের নিয়মের ব্যতিক্রম এবং যোগানের স্থিতিস্থাপকতা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। যোগানের স্থিতিস্থাপকতা কাকে বলে, এটি কিভাবে পরিমাপ করা যায় এবং কী কী বিষয়ের ওপর নির্ভর করে এই সব নিয়ে এই অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। যোগান নিয়ে আলোচনা করার মূল কারণ যোগানের সংগে উৎপাদনের এবং উৎপাদন ব্যয়ের একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে। যোগান = উৎপাদন ± মজুত মাল। আর যোগান নির্ভর করে উৎপাদন ব্যয়ের ওপর। সুতরাং উৎপাদন তত্ত্ব ও ব্যয় তত্ত্ব বিশ্লেষণের আগে যোগান বিশ্লেষণ একান্ত প্রয়োজন। এ ছাড়া চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাত দ্বারা কোন দ্রব্যের বাজার দাম নির্ধারিত হয়। সুতরাং এই কারণেও যোগানের নিয়মটি ভাল করে জানা দরকার।

এই অধ্যায় পড়লে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া যাবে ঃ

1. অর্থবিদ্যায় 'চাহিদা' শব্দটির অর্থ কি?
2. চাহিদা অপেক্ষক বলতে কি বোঝায়?
3. চাহিদার নিয়মটি কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায়?
4. চাহিদার নিয়মের কোন ব্যতিক্রম আছে কি?
5. চাহিদারেখা ধরে চলাচল ও চাহিদারেখার স্থান পরিবর্তনের মধ্যে পার্থক্য কি?
6. যোগান বলতে কি বোঝায়?
7. যোগানের নিয়ম কাকে বলে?
8. যোগানের নিয়ম কেন কার্যকরী হয়?
9. যোগানের নিয়মের কোন ব্যতিক্রম আছে কি?
10. যোগান অপেক্ষক কাকে বলে?

3.1. চাহিদার অর্থ [Meaning of Demand]

সাধারণত চাহিদা শব্দের অর্থ বিভিন্ন বস্তুগত দ্রব্য ও সেবাগত দ্রব্য পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু, বাণিজ্যিক অর্থবিদ্যায় চাহিদা বলতে কার্যকর চাহিদা (effective demand) বোঝায়। অর্থাৎ, আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে ক্রয়শক্তি, বা দ্রব্য-সামগ্রী কেনার ক্ষমতা বিশেষভাবে জড়িত। আকাঙ্ক্ষা বা অভাব পূরণের জন্য ক্রেতার ব্যয় করার সামর্থ্য এবং ক্রয়ের ইচ্ছা থাকলে চাহিদা দেখা দেয়। সুতরাং, চাহিদার দুটি উপাদান; [a] ক্রেতার দ্রব্যের প্রতি আকাঙ্ক্ষা এবং [b] ক্রেতার ক্রয়ক্ষমতা।

দ্রব্যের চাহিদা দামের ওপর নির্ভরশীল। চাহিদা সময়ের ওপরও নির্ভর করে। সুতরাং একটি নির্দিষ্ট সময়ে (দৈনিক, মাসিক বা সাপ্তাহিক) ক্রেতা বিভিন্ন দামে যে যে পরিমাণ দ্রব্য কিনতে পারে অর্থনীতিতে তাকেই চাহিদা বলে।

3.2. চাহিদা নির্ধারক বিষয়সমূহ [Determinants of Demand]

চাহিদার এই সংজ্ঞা থেকে স্পষ্ট যে, চাহিদা দামের ওপর নির্ভরশীল। X দ্রব্যের চাহিদা X দ্রব্যের ওপরই নির্ভর করে। দাম ছাড়াও আরো অন্যান্য বিষয়ের ওপরও X দ্রব্যের চাহিদা নির্ভর করে। চাহিদা

অপেক্ষক সমীকরণের সাহায্যে চাহিদার নির্ধারক বিষয়সমূহ প্রকাশ করা হল ঃ

$D_x = f(P_x, P_a.....P_c, Y, T, E, N)$

D_x = X দ্রব্যের চাহিদা,
f = ক্রিয়াগত সম্পর্ক,
P_x = X দ্রব্যের দাম,
$P_a....P_c$ = X-এর পরিবর্ত ও পরিপূরক দ্রব্যের দাম,
Y = ক্রেতার আয়।
T = ক্রেতার রুচি ও পছন্দ,
E = দামের ভবিষ্যৎ পরিবর্তন সম্পর্কে অনুমান এবং
N = ক্রেতার সংখ্যা।

আমরা নির্ধারকগুলো নিয়ে পৃথক পৃথক আলোচনা করব। দ্রব্যের দাম নিয়ে শুরু করা যাক।

1. দ্রব্যের দাম ঃ ক্রেতা কোন্ দ্রব্য কতটা পরিমাণে কিনবে তা মূলত নির্ভর করে দ্রব্যের দামের ওপর। অন্যান্য সবকিছু অপরিবর্তিত থাকলে, যে দ্রব্যের দাম কম সেই দ্রব্য সে বেশি পরিমাণে কেনে এবং যে দ্রব্যের দাম বেশি সেই দ্রব্য সে কম পরিমাণে কেনে। দাম ও চাহিদার এই কার্যকারণ সম্পর্কটিই চাহিদার নিয়ম (the law of demand) নামে পরিচিত। তবে, দাম ও চাহিদার মধ্যে এই বিপরীতমুখী সম্পর্কটি সমস্ত ধরনের দ্রব্যের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। এমন কতকগুলো দ্রব্য আছে যেখানে দাম ও চাহিদার মধ্যে এই সম্পর্কটি প্রত্যক্ষ। অর্থাৎ, ঐ সব দ্রব্যের ক্ষেত্রে দাম বাড়লে চাহিদা বাড়ে এবং দাম কমলে চাহিদা কমে।

2. অন্যান্য দ্রব্যের দাম ঃ দ্বিতীয়ত, কোন দ্রব্যের চাহিদা শুধু সেই দ্রব্যের দামের ওপরই নির্ভর করে না, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের দামের ওপরও নির্ভর করে। সংশ্লিষ্ট দ্রব্য বলতে আমরা পরিবর্ত দ্রব্য ও পরিপূরক দ্রব্যকে বুঝি। পরিবর্ত দ্রব্যের দামের গতি যেদিকে পরিবর্তিত হয় চাহিদাও সেদিকে পরিবর্তিত হয়। যেমন, যখন চায়ের দাম কমে তখন চায়ের পরিবর্ত দ্রব্য কফির চাহিদা কমে। আবার, পরিপূরক দ্রব্যের দামের যেদিকে পরিবর্তন ঘটে, অপর দ্রব্যের চাহিদা তার বিপরীতদিকে পরিবর্তিত হয়। যেমন, পেট্রোলের দাম বেড়ে গেলে গাড়ির চাহিদা কমে যায়।

3. ক্রেতার আয় ঃ তৃতীয়ত, ক্রেতার আয় চাহিদার অন্যতম প্রধান নির্ধারক। দাম কম হওয়া সত্ত্বেও অনেক জিনিস ভোগকারীর ক্রয়ক্ষমতার বাইরে থাকে। অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকলে, ক্রেতার আয় বৃদ্ধির (বা হ্রাসের) ফলে ক্রেতার চাহিদার বৃদ্ধি (বা হ্রাস) ঘটে। অবশ্য এমন কতকগুলো দ্রব্য আছে যেগুলোর চাহিদা আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস পায়। এ ধরনের দ্রব্যগুলোকে "নিকৃষ্ট দ্রব্য" (inferior goods) বলা হয়। যেমন, (not applicable, cotton is more expensive!) ভোগকারীর আয় বেড়ে গেলে সুতিবস্ত্রের তুলনায় টেরিকটন বস্ত্র বেশি আকর্ষণীয় হয়। ক্রেতার কাছে এখন সুতিবস্ত্র হল "নিকৃষ্ট দ্রব্য"। এছাড়া, চাহিদা ক্রেতার বর্তমান আয় ব্যতীত অতীত আয় (যেমন, সঞ্চয়) ও ভবিষ্যৎ আয়ের ওপরও নির্ভর করে।

4. ভোক্তার রুচি-পছন্দ ইত্যাদি ঃ ক্রেতার রুচি-পছন্দ, অভ্যাস ইত্যাদির ওপরও দ্রব্যের চাহিদা নির্ভর করে। ক্রেতার রুচি ও পছন্দের পরিবর্তন ঘটলে চাহিদারও পরিবর্তন হয়। একই দ্রব্যের প্রতি বিভিন্ন ব্যক্তির রুচি ও পছন্দ বিভিন্ন রকমের হয়। কেউ হয়ত ধুতি পরতে ভালবাসে, আবার কেউ হয়ত প্যান্ট পরতে ভালবাসে। এদের কারো রুচি-পছন্দের পরিবর্তন ঘটলে ধুতি ও প্যান্টের চাহিদারও পরিবর্তন ঘটতে পারে।

5. ভবিষ্যতে দাম বাড়ার আশংকা ঃ ভবিষ্যৎ দামের গতি পরিবর্তন সম্পর্কে ক্রেতার অনুমান দ্রব্যের চাহিদা নির্ধারণ করে। ভবিষ্যতে দাম কমতে পারে এরকম অনুমান বা আন্দাজ করতে পারলে বর্তমানে চাহিদা কমে যায়। ভবিষ্যতে দাম বাড়বে এ রকম অনুমান করলে উল্টো ফল দেখা দেবে।

6. ক্রেতার সংখ্যা ঃ পরিশেষে, ক্রেতার সংখ্যার ওপরও চাহিদা নির্ভর করে। যে দ্রব্যের ক্রেতার সংখ্যা বেশি (বা কম) সেই দ্রব্যের চাহিদাও বেশি (বা কম)।

মন্তব্য ঃ নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, দ্রব্যের দামই ব্যক্তিগত চাহিদার প্রধান নির্ধারক। অন্যান্য সবকিছু স্থির থাকলে, দ্রব্যের দাম কমলে চাহিদা বাড়ে ও দাম বাড়লে চাহিদা কমে। ক্রেতার আয় বেশি হলেও দেখা যায় যে, দাম বেড়ে যাওয়ার দরুন অনেক দ্রব্য ক্রেতার ক্রয়শক্তির বাইরে চলে যায়। বর্তমানে, মাছের দাম অত্যধিক বেড়ে যাওয়াতে মাছের চাহিদা হ্রাস পেয়েছে। অবশ্য, কখনো কখনো ক্রেতার রুচি ও পছন্দ চাহিদা নির্ধারণে প্রধান হয়ে উঠলেও সাধারণত দ্রব্যের দামের ওপরই চাহিদা নির্ভর করে।

3.3. চাহিদা-সূচি ও চাহিদা-রেখা [Demand Schedule and Demand Curve]

চাহিদা-সূচি ঃ একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোন ক্রেতা বা পরিবার বিভিন্ন দামে যে পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করতে পারে তাকে চাহিদা বলে। যে তালিকায় ক্রেতার এই ক্রয় পরিকল্পনা দেখানো হয়, তাকে পরিবারের বা ভোক্তার চাহিদা-সূচি বলে। অর্থাৎ চাহিদা-সূচিতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোন দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন দামে কোন ব্যক্তি কতটা ঐ দ্রব্য কিনতে পারে, তা দেখানো হয়। চাহিদা-সূচি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, দাম বাড়লে (কমলে) চাহিদা কমে (বাড়ে)। চাহিদা-সূচি থেকে চাহিদার এই প্রকৃতি (বা, চাহিদা-সূত্র) অতি সহজেই বোঝা যায়।

ধরা যাক, কোন একজন মধ্যবিত্ত ক্রেতা 6 টাকা দামে 2 কিলোগ্রাম, 5 টাকা দামে 3 কিলোগ্রাম, 4 টাকা দামে 5 কিলোগ্রাম ইত্যাদি পরিমাণ চিনি ক্রয় করে। আমরা, এই তথ্যটি একটি সারণির সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে পারি। নিচের সারণিতে একটি কাল্পনিক চাহিদা-সূচির উদাহরণ দেওয়া হল ঃ

সারণি 3.1 : ব্যক্তিগত বা পরিবারের চাহিদা-সূচি

প্রতি কিলোগ্রাম চিনির দাম	চিনির চাহিদার পরিমাণ
[টাকায়]	[মাসিক] [কিলোগ্রাম]
6	2
5	3
4	5
3	7
2	10
1	15

ওপরের সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে, প্রতি কিলোগ্রাম চিনির দাম 6 টাকার তুলনায় যত কম হচ্ছে চিনির চাহিদার পরিমাণ তত বাড়ছে। অথবা, সারণির নিচের দিক থেকে শুরু করলে দেখা যাচ্ছে দাম 1 টাকার তুলনায় যত বেশি হচ্ছে ততই চিনির চাহিদা হ্রাস পাচ্ছে। অর্থাৎ, দাম ও চাহিদার মধ্যে সম্পর্ক বিপরীতমুখী। বেশি দামে কম চাহিদা ও কম দামে বেশি চাহিদা হয়। এটাই চাহিদার নিয়মের মূল কথা।

চাহিদা রেখা ঃ বিশেষ ভোক্তা বা পরিবারের এই চাহিদা-সূচিকে পাশের চিত্রটির সাহায্যেও দেখানো যায়। 3.1 নং চিত্রের উল্লম্ব অক্ষে চিনির দাম এবং অনুভূমিক অক্ষে পরিবারের চিনি ক্রয়ের পরিমাণ দেখানো হয়েছে। DD_1 রেখাটি পরিবারটির চিনির চাহিদা রেখা। এই রেখার বিভিন্ন বিন্দু বিভিন্ন দামে কত পরিমাণ চাহিদা হবে তার ইংগিত দিচ্ছে। যেমন, I বিন্দুর দ্বারা বোঝানো হচ্ছে যে, দাম যখন 6 টাকা ঐ পরিবারের ক্রয়ের পরিমাণ হবে তখন 2 কিলোগ্রাম। আবার K বিন্দু থেকে দেখা যায় যে, দাম যখন 4 টাকা, চাহিদার পরিমাণ তখন 5 কিলোগ্রাম। এভাবে দাম ও চাহিদার পরিমাণের যে নির্দিষ্ট সম্পর্ক আছে তা রেখাটির বিভিন্ন বিন্দু থেকে সহজেই বোঝা যাচ্ছে। রেখাটি বাঁদিক থেকে ডানদিকে ঢালু হয়ে নেমে গেছে (has sloped downward from the left to the right)। এর অর্থ, চিনির দাম কমলে ঐ পরিবারের চিনি ক্রয়ের পরিমাণ বাড়ে আর দাম বাড়লে ক্রয়ের পরিমাণ কমে যায়।

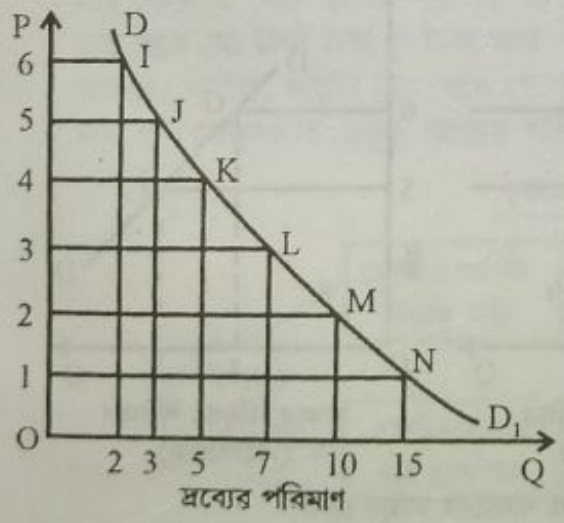

চিত্র 3.1 ঃ ব্যক্তিগত রেখা

3.4. বাজারের চাহিদা-সূচি ও বাজারের চাহিদা-রেখা [Market Demand Schedule and Market Demand Curve]

আমরা যদি ব্যক্তিবিশেষের চাহিদার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারি তাহলে বাজারের মোট চাহিদাকেও ব্যাখ্যা করতে পারব। বস্তুত, বাজার চাহিদা ব্যক্তিবিশেষের চাহিদার অনুভূমিক যোগফল। অর্থাৎ,

বাজারের চাহিদা সমস্ত ব্যক্তির সম্মিলিত বা মোট চাহিদা। বিভিন্ন দামে বাজারের প্রতিটি ক্রেতা একত্রে কোন একটি দ্রব্য যে পরিমাণ ক্রয় করে তার তালিকাকে বাজারের চাহিদা-সূচি বলে। কিভাবে বাজারের চাহিদা-সূচি তৈরি করা হয়, তার হিসাব নিচের সারণিতে দেখানো হল।

আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা অনুমান করে নিচ্ছি যে, আমাদের কল্পিত বাজারে তিনটি মাত্র ক্রেতা আছে। এই তিন ব্যক্তির ব্যক্তিগত চাহিদার যোগফলই বাজারের চাহিদা-সূচি।

সারণি 3.2 : বাজারের বা মোট চাহিদা-সূচি

প্রতি কিলোগ্রাম চিনির দাম [টাকায়]	বিভিন্ন ব্যক্তির চাহিদার পরিমাণ			বাজারের মোট চাহিদা [প্রতি মাসে] [কিলোগ্রাম]
	A	B	C	
6	1	2	0	3
5	2	3	0	5
4	3	4	1	8
3	4	5	2	11
2	5	6	3	14
1	6	7	4	17

প্রতি কিলোগ্রাম চিনির দাম যখন 6 টাকা তখন A ও B এই দুই ব্যক্তির চিনির ক্রয়ক্ষমতা আছে। ঐ দামে C ব্যক্তি চিনি ক্রয়ে অসমর্থ। 5 টাকা দামে চিনি বিক্রি হলেও তা C ব্যক্তির ক্রয়ক্ষমতার বাইরে। তাই বাজারে 6 ও 5 টাকা দামে চিনির চাহিদা A ও B ব্যক্তির সম্মিলিত চিনির চাহিদা। এরপর চিনির দাম আরও হ্রাস পেলে A ও B ব্যক্তির চিনি ক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং C ব্যক্তি মাত্র 1 কিলোগ্রাম চিনি কেনে। দাম আরও হ্রাস পেলে প্রতিটি ব্যক্তির চিনি ক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং, বাজারের চাহিদা-সূচিও বলে যে, দাম কমলে (বাড়লে) বাজারে চাহিদা বাড়ে (কমে)।

বাজারের চাহিদা রেখা ঃ বাজারের চাহিদা-সূচি যেহেতু ব্যক্তিগত সূচির সমষ্টিমাত্র, সেহেতু বাজারের চাহিদা রেখা ব্যক্তিগত চাহিদা রেখার যোগফলমাত্র। 3.2 সারণির ভিত্তিতে বাজারের চাহিদা রেখার অঙ্কন পদ্ধতি চিত্র 3.2-নং চিত্রে দেখানো হল।

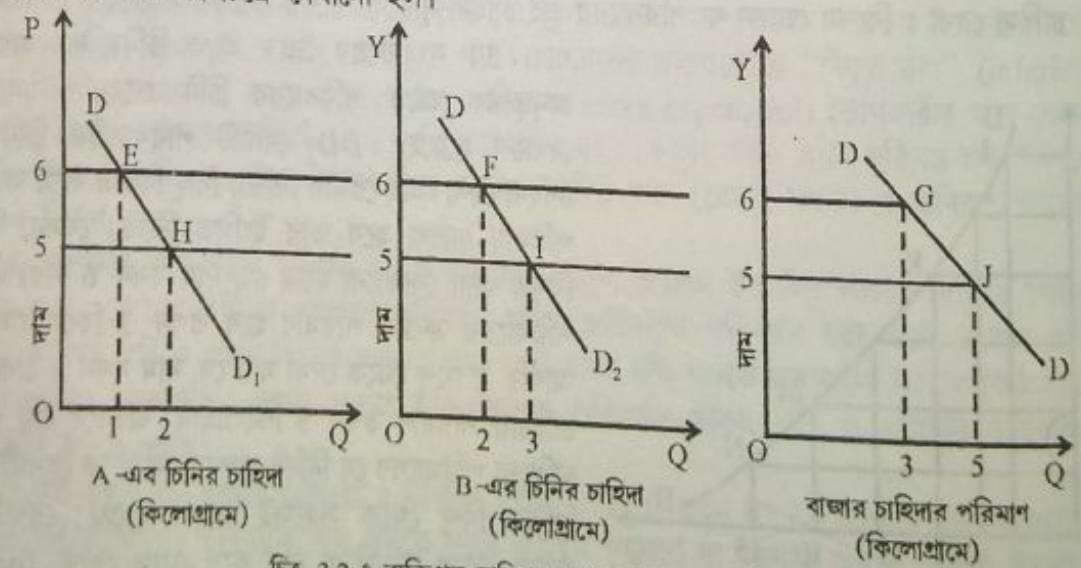

চিত্র 3.2 ঃ ব্যক্তিগত চাহিদা রেখা ও বাজারের চাহিদা রেখা

বিভিন্ন ক্রেতার চাহিদা রেখা যোগ করে কিভাবে বাজারের চাহিদা রেখা পাওয়া যায় তা সহজভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য ধরে নিচ্ছি যে বাজারে A ও B নামক দুটি ক্রেতা আছে। 3.2 নং চিত্রের প্রথম চিত্রে A-এর ও দ্বিতীয় চিত্রে C-এর চাহিদার পরিমাণ ও দামের মধ্যে সম্পর্ক দেখানো হয়েছে এবং তৃতীয় চিত্রে বাজারের চাহিদার পরিমাণ ও দামের মধ্যে সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। আগের চিত্রের মতই OX অক্ষে চিনির চাহিদার পরিমাণ এবং OY-অক্ষে দাম মাপা হয়েছে। E বিন্দু অনুযায়ী 'A' 6 টাকা দামে 1 কিলোগ্রাম এবং F বিন্দু অনুযায়ী 'B' ঐ দামে 2 কিলোগ্রাম চিনি কেনে। সুতরাং, বাজারের চিনির সামগ্রিক চাহিদা 3 কিলোগ্রাম। G বিন্দু তারই ইংগিত দিচ্ছে। অর্থাৎ, $6G = 6E + 6F$। আবার, দাম

হ্রাস পেলে প্রতিটি ব্যক্তির চাহিদা বাড়ে বলে বাজারে চাহিদারও বৃদ্ধি ঘটে। সুতরাং, $5J = 5H + 5I$। যেমন, E ও H বিন্দু যোগ করে A-এর চাহিদা রেখা DD_1, F ও I বিন্দু যোগ করে B-এর চাহিদা রেখা DD_2 পাই, তেমনি G এবং J বিন্দু যোগ করে DD বাজারের চাহিদা রেখা পাই। ব্যক্তিগত চাহিদা রেখার মতো বাজারের চাহিদা রেখাও নিম্নগামী।

3.5. চাহিদার নিয়ম [The Law of Demand]

আমরা এখন ব্যক্তিগত ও বাজারের চাহিদা তালিকা থেকে বলতে পারি যে, অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকলে (ceteris paribus clause বা other things remaining the same) স্বাভাবিক দ্রব্য (normal goods) বা উৎকৃষ্ট দ্রব্যের (superior goods) ক্ষেত্রে দাম কমলে চাহিদা বাড়ে এবং দাম বাড়লে চাহিদা কমে। আমাদের আলোচ্য উদাহরণে চিনিকে স্বাভাবিক দ্রব্য বা উৎকৃষ্ট দ্রব্য হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। মোট কথা, দাম ও চাহিদার পরিমাণের সম্পর্ক বিপরীতমুখী। এটিই চাহিদার নিয়ম। অর্থাৎ,

$$D_x = f(P_x), \text{ অন্যান্য বিষয়গুলো স্থির}$$

অর্থাৎ, চাহিদার এই নিয়ম কার্যকরী যদি নিম্নলিখিত বিষয়গুলো স্থির থাকে ঃ [a] ক্রেতার আর্থিক আয়; [b] ক্রেতার রুচি, পছন্দ ও অভ্যাস; [c] অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের [পরিবর্ত দ্রব্য ও পরিপূরক দ্রব্য] দাম, [d] সময়; [e] ক্রেতার সংখ্যা ইত্যাদি।

3.5.1. চাহিদা রেখা নিম্নমুখী হয় কেন? [Why Does Demand Curve Slope Downward?]

চাহিদা রেখার ঋণাত্মক ঢালের পিছনে চারটি কারণ আছে। কারণগুলো হল ঃ

1. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগিতার নিয়ম ঃ ক্রেতার ক্রয় পরিকল্পনা প্রান্তিক উপযোগিতার নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হয়। এই নিয়ম অনুসারে যে কোন দ্রব্য ক্রমাগত ভোগ করতে থাকলে তার প্রান্তিক উপযোগিতা হ্রাস পায়। সুতরাং, প্রান্তিক উপযোগিতা রেখাও নিম্নাভিমুখী হয়। আবার, ক্রেতা ভারসাম্যে বা সর্বাধিক তৃপ্তির বিন্দুতে তখনই পৌঁছয় যখন দাম ও প্রান্তিক উপযোগিতা পরস্পরের সমান হয়। এখন, দাম কমে গেলে দাম ও প্রান্তিক উপযোগিতার পরস্পরের সমান হয়। এখন, দাম কমে গেলে দাম ও প্রান্তিক উপযোগিতার সমতা নষ্ট হয়। তখন ক্রেতা দাম ও প্রান্তিক উপযোগিতার মধ্যে সমতা আনার জন্য বেশি পরিমাণে দ্রব্যটি কেনে। সুতরাং, প্রান্তিক উপযোগিতার নিয়ম থেকে বলা যায় যে দাম কমলে চাহিদা বাড়ে। বিপরীত দিক থেকে দেখলে দাম বাড়লে চাহিদা কমে।

2. আয় প্রভাব ঃ দ্রব্যের দাম কমে গেলে (বা বেড়ে গেলে) ক্রেতার প্রকৃত আয় বা ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে (বা কমে)। তবে এক্ষেত্রে ক্রেতার আর্থিক আয় একই থাকে। ধরা যাক, ক্রেতা প্রতি সপ্তাহে 4 কিলোগ্রাম মাছ কেনে ও মোট ব্যয়ের পরিমাণ 60 টাকা। এখন মাছের দাম কিলোগ্রাম প্রতি 14 টাকা হলে সে মোট ব্যয় করে 56 টাকা এবং 4 টাকা তার পকেটে থেকে যায়। এই অবস্থায় সে বেশি পরিমাণে মাছ কিনতে পারবে। আবার, মাছের দাম বেড়ে গেলে ক্রেতার প্রকৃত আয় হ্রাস পায় ও সে কম পরিমাণে মাছ কেনে। দাম পরিবর্তনজনিত প্রকৃত আয়ের পরিবর্তনকে আয় প্রভাব বলে।

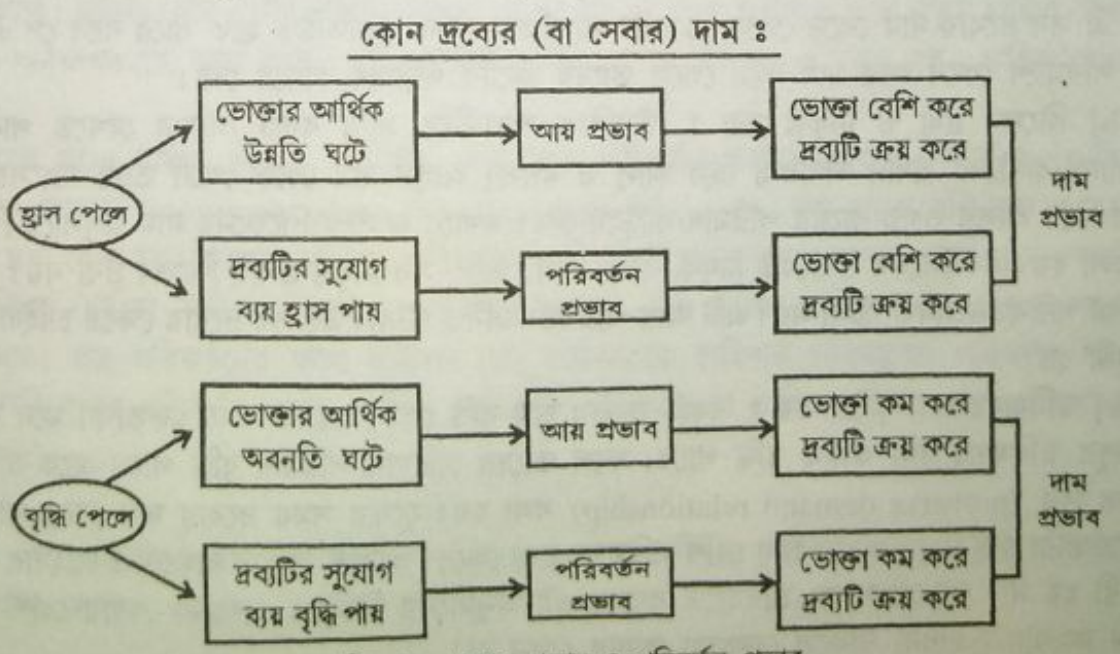

চিত্র 3.3 ঃ আয় প্রভাব ও পরিবর্তন প্রভাব

3. পরিবর্তন প্রভাব ঃ কোন দ্রব্যের দাম কমে গেলে (অন্যান্য দ্রব্যের দাম স্থির থাকলে) তার পরিবর্ত দ্রব্য অপেক্ষাকৃত দামী হয়। চা ও কফি পরিবর্ত দ্রব্য। চায়ের দাম কমে গেলে কফি অপেক্ষাকৃত দামী হয়, বা চা কফির তুলনায় সস্তা হয়। এই অবস্থায় ক্রেতা কফির ওপর ব্যয় কমিয়ে দিয়ে চায়ের চাহিদা বাড়িয়ে দেয়। অপরদিকে, চায়ের দাম বেড়ে গেলে ক্রেতা তার চায়ের চাহিদা কমিয়ে দিয়ে কফির চাহিদা বাড়িয়ে দেয়। অর্থাৎ, দাম কমলে চাহিদা বাড়ে ও দাম বাড়লে চাহিদা কমে। 3.3 চিত্রের সাহায্যে এই দুই প্রভাব ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

4. ঐকতানমূলক প্রতিক্রিয়া ঃ পরিশেষে, 'ঐকতানমূলক প্রতিক্রিয়ার' (bandwagon effect) জন্যও বাজার চাহিদা রেখা নিম্নমুখী হয়ে থাকে। সমাজের অন্যান্য গোষ্ঠীর সংগে কোন ভোক্তা যখন নিজেকে প্রকাশ করতে চায় তখন ঐকতানমূলক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ, কোন বিশেষ দ্রব্য যদি সমাজের প্রতিটি বা বিশেষ বিশেষ ভোক্তার কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে তখন অন্যান্য ক্রেতারা ঐ দ্রব্য ক্রয় করে ঐ ক্রেতাগোষ্ঠীর সংগে একসারিতে অবস্থান করতে চায়। সুতরাং, দাম হ্রাস পেলে ঐকতানমূলক প্রতিক্রিয়ার জন্য দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। অথবা, ঐকতানমূলক প্রতিক্রিয়ার জন্য বাজার চাহিদা রেখা ঋণাত্মক ঢালের হয়ে থাকে।

মন্তব্য ঃ মনে রাখতে হবে, ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগিতার নিয়ম, আয় প্রভাব ও পরিবর্ত প্রভাব এবং ঐকতানমূলক প্রতিক্রিয়া একসংগে কাজ করার ফলে চাহিদা রেখা নিম্নমুখী হয় অর্থাৎ এর ঢাল ঋণাত্মক হয়।

3.6. চাহিদার নিয়মের ব্যতিক্রম [Exceptions to the Law of Demand]

তবে চাহিদার নিয়ম সর্বত্র প্রযোজ্য হয় না। কেবল সাধারণ দ্রব্য বা উৎকৃষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদা রেখা নিম্নমুখী। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে চাহিদা রেখা উর্ধ্বমুখী অর্থাৎ এর ঢাল ধনাত্মক হয়।

[a] দৃষ্টি আকর্ষকপূর্ণ দ্রব্য ঃ এমন কিছু দ্রব্য যা একধারে ব্যয়সাধ্য এবং যা ক্রেতা দ্রব্যের নিজস্ব গুণের জন্য কেনে না, শুধু অপরকে দেখাবার জন্য কেনে, তাদের দৃষ্টি আকর্ষকপূর্ণ দ্রব্য (conspicuous consumption goods) বলে। যেমন—মণিমুক্তো, ব্যয়বহুল সুগন্ধি দ্রব্য ইত্যাদি। এই সব দ্রব্যের দাম সামান্য কমে গেলে ক্রেতা কখনোই কিনবে না। কারণ, এতে ক্রেতার টাকার অহংকার বা বড়লোকীভাব প্রকাশ পাবে না। তাই সে এই ধরনের দ্রব্য তখনই বেশি কেনে যখনই এদের দাম বেশি হয়। অন্যান্য প্রয়োজনীয় সংবাদাদির অভাবে—যেমন একটি দ্রব্যের গুণগত দিক, পরিবর্ত দ্রব্যের অস্তিত্ব, ইত্যাদি—অনেক দ্রব্যের দামকেই এদের গুণগত মানের সূচক (index of quality) বলে ধরা হয়। কতকগুলো দ্রব্য যেমন কনটেসা গাড়ী অথবা বিমলের সুটিং ইত্যাদির দাম অধিক বলেই লোকে ক্রয় করে। এই সকল দ্রব্য ক্রয়ের মূল আকর্ষণ হল ওদের দাম এবং ওদের দাম বৃদ্ধি পেলে ওদের আকর্ষণও বৃদ্ধি পায়। এই ফলকে মূল্য (snob value) বলে বর্ণনা করা হয়। একে 'চাহিদার সামাজিক মর্যাদামূলক প্রভাব' (snob effect) বলে। ঐ সব দ্রব্যের দাম বেড়ে গেলে ভোক্তার সামাজিক মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে বলে সে ঐ দ্রব্য বেশি পরিমাণে কেনে আর দাম কমে গেলে তাদের ক্রয়ের পরিমাণ কমিয়ে দেয়।

[b] গিফেন দ্রব্য ও নিকৃষ্ট দ্রব্য ঃ ঊনবিংশ শতাব্দীতে স্যার রবার্ট গিফেন দেখতে পান যে, আয়ার্ল্যান্ড-বাসীদের প্রধান খাদ্যদ্রব্য ছিল আলু ও মাংস। আলুর দাম বেড়ে গেলে তারা মাংসের ব্যয় কমিয়ে দিয়ে আলুর ওপর ব্যয়ের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। এখানে আলুকে গিফেনের নাম অনুসারে গিফেন দ্রব্য বলা হয়। সব গিফেন দ্রব্যকেই নিকৃষ্ট দ্রব্য বলে। তবে, সব নিকৃষ্ট দ্রব্যই গিফেন দ্রব্য নয়। নিকৃষ্ট দ্রব্য দাম পরিবর্তনজনিত ঘটনা নয়। এটি আয় পরিবর্তনজনিত ঘটনা। এই সব দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদা রেখা উর্ধ্বমুখী হয়।

[c] ভবিষ্যতে দাম বৃদ্ধির ভয় ঃ একটি দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেলে অনেক সময় ক্রেতাগণ মনে করেন যে, অদূর ভবিষ্যতে দাম আরও বৃদ্ধি পাবে। ফলে তাদের চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। একে চাহিদার বিপরীত সূত্র (preverse demand relationship) বলা হয়। যুদ্ধের সময় দ্রব্যের দাম বেড়ে যাওয়ার ভয়ে ক্রেতারা দ্রব্য মজুত করার জন্য বেশি পরিমাণে দ্রব্য কেনে। আবার, শেয়ার বাজারেও চাহিদার নিয়ম কার্যকরী হয় না। শেয়ারের দাম ভবিষ্যতে বাড়বে এই অনুমানের ভিত্তিতে ক্রেতারা শেয়ার বেশি কেনে ও দাম কমবার সম্ভাবনা থাকলে ক্রেতারা শেয়ার কেনে না।

[d] ভেবলেন প্রতিক্রিয়া ঃ পরিশেষে দেখা যায় যে, অনেক ক্রেতা দামের ভিত্তিতে দ্রব্যের গুণাগুণ বিচার করে। যে দ্রব্যের দাম যত বেশি সেই দ্রব্য তত গুণসম্পন্ন হয়। ক্রেতা দাম বেশি হলেও উচ্চ গুণসম্পন্ন দ্রব্য কেনে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে চাহিদা রেখার ঢাল ধনাত্মক। একে ভেবলেনের (Thorstein Veblen) নামানুসারে 'ভেবলেন প্রতিক্রিয়া' (Veblen effect) বলে।

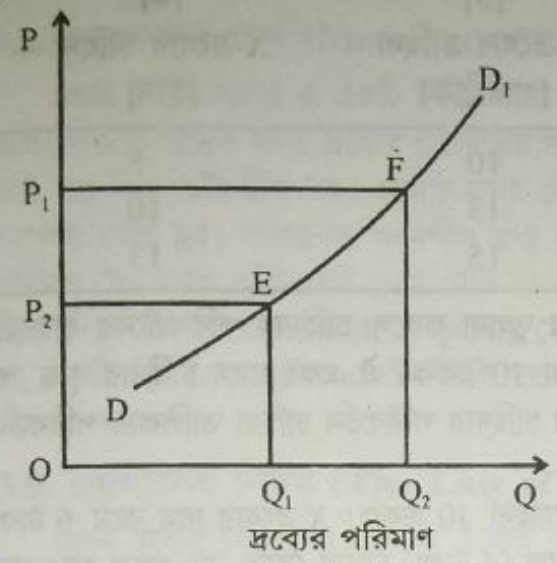

চিত্র 3.4 ঃ ধনাত্মক ঢালের চাহিদা রেখা

3.4 চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, কোন দ্রব্যের দাম যখন OP তখন দ্রব্যের ক্রয়ের পরিমাণ OQ_1। এখন দাম বেড়ে OP_2 হওয়ায় চাহিদা বেড়ে OQ_2 হয়। চাহিদা রেখা DD_1 তাই বাঁদিক থেকে ডানদিকে ওপরের দিকে উঠেছে। অর্থাৎ, চাহিদা রেখার ঢাল ধনাত্মক।

3.7 চাহিদার পরিবর্তন বনাম চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন [Change in Demand vs. Change in Quantity Demanded]

আমরা দাম ও চাহিদার মধ্যে সম্পর্ক জানি। কোন দ্রব্যের দাম বাড়লে চাহিদা কমে ও দাম কমলে চাহিদা বাড়ে।

চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন কাকে বলে? ঃ দাম পরিবর্তনের জন্য একই চাহিদা রেখার ওপরে ও নিচে চাহিদার পরিমাণের ওঠানামাকে 'চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন' বলে। একে আমরা চাহিদার 'সম্প্রসারণ ও সংকোচন'ও বলতে পারি। চাহিদা নির্ধারক অন্যান্য সকল বিষয় অপরিবর্তিত থেকে যদি কোন দ্রব্যের দামের পরিবর্তন হয় তাহলেই এটি ঘটে।

চাহিদার পরিবর্তন কাকে বলে? ঃ দাম একই থেকে যদি চাহিদা বেড়ে যায় বা কমে যায় তবে তাকে 'চাহিদার পরিবর্তন' বলে। চাহিদা নির্ধারক বিষয়গুলোর পরিবর্তন ঘটলে চাহিদার বৃদ্ধি বা হ্রাস হয়। যেমন—ক্রেতার আয়, ক্রেতার রুচি ও পছন্দ, পরিপূরক দ্রব্যের দাম, ক্রেতার সংখ্যা ইত্যাদি। এগুলোর পরিবর্তন চাহিদায় পরিবর্তন আনে। ধরা যাক, ক্রেতার আয় বেড়ে গেছে। এই অবস্থায় বর্তমান দামেই ভোগকারী আগের তুলনায় বেশি জিনিস কিনতে পারে। আবার, আয় কমে গেলে ঐ দামেই আগের তুলনায় ক্রেতা কম জিনিস কিনতে পারে। একই দামে চাহিদার পরিমাণ আগের তুলনায় বেশি বা কম হলে তাকে চাহিদার পরিবর্তন বলে। অর্থাৎ, এককথায় চাহিদার পরিবর্তন বলতে চাহিদার বৃদ্ধি বা হ্রাসকে বোঝায়। চাহিদার বৃদ্ধি বা হ্রাস চাহিদা তালিকার বা চাহিদা রেখার স্থান পরিবর্তন (shift of the demand curve) ঘটায়। চাহিদা বেড়ে গেলে পুরানো চাহিদা রেখার ডানদিকে ও ওপরের দিকে নতুন চাহিদা রেখার সৃষ্টি হয়। অনুরূপভাবে, আয় কমে গেলে পুরানো চাহিদা রেখার বাঁদিকে ও নিচে নতুন চাহিদা রেখার সৃষ্টি হয়।

উভয়ের মধ্যে তফাৎ কী? ঃ চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন বলতে চাহিদা রেখার ওপর-নিচে ওঠানামাকে বোঝায় (movement along the same demand curve)। কম দামে বেশি দ্রব্য ও বেশি দামে কম দ্রব্য কেনা হয়। সুতরাং, চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তনই চাহিদার সম্প্রসারণ ও সঙ্কোচন। অর্থাৎ, অন্যান্য বিষয় (চাহিদা নির্ধারক বিষয়) অপরিবর্তিত থাকলে, দাম কমলে চাহিদা বাড়ে ও দাম বাড়লে চাহিদা কমে। দাম পরিবর্তনের ফলে চাহিদার এই ওঠানামাকে চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন বলে। চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন বলতে চাহিদা তালিকার পরিবর্তন বা চাহিদা রেখার স্থান পরিবর্তনকে বোঝায় না।

উদাহরণ

3.3 নং সারণিটিতে কোন একটি দ্রব্যের (যেমন *X*-দ্রব্য) চাহিদার পরিবর্তন ও চাহিদার পরিমাণের মধ্যে পার্থক্য দেখানো হয়েছে।

সারণি 3.3. : চাহিদার পরিবর্তন ও চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন

[1] X-দ্রব্যের দাম	[2] X-দ্রব্যের চাহিদা [বৃদ্ধি]	[3] X-দ্রব্যের চাহিদা [প্রারম্ভিক]	[4] X-দ্রব্যের চাহিদা [হ্রাস]
6 টাকা	12	10	8
5 ,,	15	13	10
4 ,,	20	15	13

3 নং স্তম্ভের (column) সঙ্গে 2 এবং 4 নং স্তম্ভের তুলনা করলে চাহিদার পরিবর্তনের ধারণাটি বোঝা যায়। *X*-দ্রব্যের দাম যখন 6 টাকা তখন মূল চাহিদা 10 একক। ঐ একই দামে চাহিদার বৃদ্ধি ও হ্রাস যথাক্রমে 12 একক ও 8 একক। সুতরাং, একই দামে চাহিদার পরিবর্তন চাহিদা তালিকায় পরিবর্তন আনে।

অপরদিকে, *X* দ্রব্যের দাম যখন 6 টাকা তখন মূল চাহিদা 10 একক। *X* দ্রব্যের দাম কমে 6 টাকা হওয়াতে চাহিদার পরিমাণ বেড়ে 15 একক হয়। দাম কমলে (4 টাকা) চাহিদা বেড়ে 20 একক হয়। দাম পরিবর্তনে কিন্তু চাহিদা তালিকার কোন পরিবর্তন হয় না। চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন একটি নির্দিষ্ট চাহিদা তালিকার ওঠা-নামা। এখনে 2 বা 3 বা 4 নং স্তম্ভে দাম পরিবর্তনের জন্য চাহিদার পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি দেখানো হয়েছে। কোন স্তম্ভের সঙ্গে অন্য কোন স্তম্ভের তুলনা করা হয় না। বিভিন্ন সারির (row) মধ্যেই তুলনা করে চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন (বা চাহিদার সংকোচন ও সম্প্রসারণ) বোঝানো হয়।

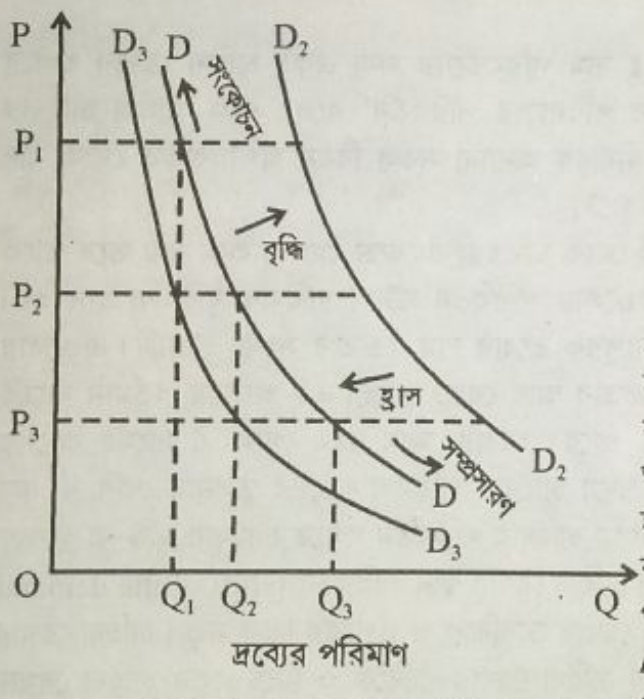

চিত্র 3.5 ঃ চাহিদার পরিবর্তন ও চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন

3.5 নং চিত্রে চাহিদার পরিবর্তন ও চাহিদার পরিমাণের মধ্যে পার্থক্য দেখানো হয়েছে। *DD* হল *X* দ্রব্যের মূল চাহিদা রেখা। *X* দ্রব্যের দাম OP_1 হলে ক্রেতা OQ_1 পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করে। দাম কমে OP_2 হলে চাহিদা বেড়ে OQ_2 এবং দাম আরও কমে OP_3 হলে চাহিদা আরও বেড়ে OQ_3 হয়। অর্থাৎ, দাম কমলে চাহিদার সম্প্রসারণ ও দাম বাড়লে চাহিদার সংকোচন ঘটে। একে চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন বলে। চিত্রে তীর-চিহ্ন দিয়ে *DD* রেখার ওপর চাহিদার সম্প্রসারণ ও সংকোচন দেখানো হয়েছে।

এখন ধরা যাক, *X* দ্রব্যের দাম অপরিবর্তিত থেকে ক্রেতার আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। *X* দ্রব্য স্বাভাবিক দ্রব্য হলে ঐ নির্দিষ্ট দামে ক্রেতা এখন আগের চেয়ে বেশি পরিমাণে *X* দ্রব্য ক্রয় করবে। সুতরাং, *X* দ্রব্যের চাহিদা রেখা ডানদিকে সরে আসবে। *DD* চাহিদা রেখা আয় বৃদ্ধির জন্য স্থান পরিবর্তন করে D_2D_2 হবে। তাই চিত্রে তীর-চিহ্ন দিয়ে চাহিদার বৃদ্ধি ও হ্রাস দেখানো হয়েছে।

আবার, *X* দ্রব্য যদি নিকৃষ্ট দ্রব্য হয় তাহলে আয়ের বৃদ্ধি সত্ত্বেও ক্রেতা কম পরিমাণে *X* দ্রব্য ক্রয় করবে। এক্ষেত্রে *DD* চাহিদা রেখার স্থান পরিবর্তন ঘটবে এবং চাহিদা রেখা বাঁদিকে সরে আসবে।

D_3D_3 এ ধরনের একটি চাহিদা রেখা। দাম অপরিবর্তিত থেকে এবং ক্রেতার আয় বৃদ্ধি ঘটলেও *X* নিকৃষ্ট দ্রব্য বলেই *X*-এর চাহিদা রেখা বাঁদিকে নিচে নেমে গেছে।

চাহিদা রেখা কেন স্থান পরিবর্তন করে? ঃ চাহিদা রেখার এই স্থান পরিবর্তনের পিছনে আয়ের পরিবর্তনই একমাত্র কারণ নয়। দ্রব্যের নিজ দাম অপরিবর্তিত থেকে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের (পরিবর্ত ও পরিপূরক দ্রব্য) দাম, রুচি ও পছন্দ, ভবিষ্যতে দাম পরিবর্তনের সম্ভাবনা, আয় বণ্টন, সরকারী করনীতি

ইত্যাদির পরিবর্তনেও চাহিদা রেখার স্থান পরিবর্তন ঘটে। এছাড়া বর্তমানকালে বিজ্ঞাপনও চাহিদা রেখার স্থান পরিবর্তন ঘটায়।

3.8. যোগানের অর্থ [Meaning of Supply]

একটি নির্দিষ্ট সময়ে ও একটি নির্দিষ্ট দামে কোন বিক্রেতা যে পরিমাণ দ্রব্য বিক্রি করে তাকে যোগান বলে। আমরা অনেক সময় দ্রব্যের যোগানের পরিমাণ ও তার উৎপাদনের পরিমাণের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না। কিন্তু এটা ঠিক নয়। অনেক সময় দেখা যায় উৎপাদনের পরিমাণ বাজারে যোগানের পরিমাণ অপেক্ষা বেশি হয়। সাধারণত পচনশীল দ্রব্য বাজারে আসার আগেই নষ্ট হতে পারে বলে উৎপাদনের পরিমাণ যোগানের পরিমাণের চেয়ে বেশি হয়। অপরদিকে, মজুত ভাণ্ডার থেকে উৎপাদিত দ্রব্য বাজারে ছেড়ে দিলে উৎপাদনের পরিমাণের তুলনায় যোগানের পরিমাণ বেশি হয়। সুতরাং, আমরা বলতে পারি যে, একটি নির্দিষ্ট সময়ে ও একটি নির্দিষ্ট দামে বিক্রেতারা কী পরিমাণ দ্রব্য বিক্রি করতে ইচ্ছুক তাকে যোগান বলে।

3.9. যোগানের নিয়ম [The Law of Supply]

কোন দ্রব্যের যোগানের সঙ্গে ঐ দ্রব্যের দামের যে ক্রিয়াগত সম্পর্ক আছে তা এভাবে প্রকাশ করা যায় ঃ

$$S_x = f(P_x)$$

এখানে S_x হল X দ্রব্যের যোগান এবং P_x হল X দ্রব্যের দাম। এই সমীকরণটিকে যোগান অপেক্ষক (the supply function) বলে। এটি বলে দেয় যে, দাম ও যোগানের মধ্যে সম্পর্ক প্রত্যক্ষ। অর্থাৎ, স্বাভাবিক অবস্থায় দ্রব্যের দাম বাড়লে যোগান বাড়ে এবং দাম কমলে যোগান কমে। এটিই যোগানের নিয়ম।

3.10. যোগানের নির্ধারক বিষয় [Determinants of Supply]

কোন দ্রব্যের যোগান ঐ দ্রব্যের দামের ওপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল। অর্থাৎ, দাম কমলে (বাড়লে) যোগান কমে (বাড়ে)। তবে, কোন দ্রব্যের যোগান শুধু ঐ দ্রব্যের দামের ওপরই নির্ভর করে না। দ্রব্যের যোগান অনেক বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল।

[1] দ্রব্যের দাম ঃ কোন দ্রব্যের যোগান প্রধানত ঐ দ্রব্যের দামের ওপর নির্ভর করে। দ্রব্যের যোগান ও দ্রব্যের দামের মধ্যে সম্পর্ক প্রত্যক্ষ। অর্থাৎ, দাম বাড়লে যোগান বাড়ে এবং দাম কমলে যোগান কমে। তাই যোগান রেখার ঢাল ধনাত্মক।

[2] অন্যান্য দ্রব্যের দাম ঃ ধরা যাক, বাজারে দুটি দ্রব্য X ও Y যোগান দেওয়া হচ্ছে। X দ্রব্যের দাম বেড়ে গেলে ও Y দ্রব্যের দাম স্থির থাকলে Y দ্রব্যের উৎপাদন কম লাভজনক হয়। এই অবস্থায় X-এর দাম বৃদ্ধিতে Y-দ্রব্যের যোগান হ্রাস পায়। আবার যৌথ দ্রব্যের (joint product) ক্ষেত্রে, যথা— ভেড়ার মাংস ও পশম, ধান ও খড়, তুলা ও তুলাবীজ ইত্যাদি কোন একটি দ্রব্যের দামের পরিবর্তনে শুধু ঐ দ্রব্যের যোগানেরই পরিবর্তন হয় না, তার সঙ্গে অন্য একটি দ্রব্যেরও যোগান পরিবর্তিত হয়।

[3] উৎপাদনের উপকরণের দাম ঃ কোন উপকরণের দাম বেড়ে গেলে সেই উপকরণটি যে দ্রব্যের উৎপাদনকার্যে নিয়োজিত হয় সেই দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যায়। ফলে মুনাফার হারের পরিবর্তন হয় এবং উৎপাদক অনেক সময় ঐ দ্রব্যের উৎপাদন কমিয়ে দিয়ে অন্য দ্রব্যের উৎপাদন বাড়িয়ে দেয়। সুতরাং, যোগানও পরিবর্তিত হয়।

[4] সময় ঃ অতি স্বল্পকালীন সময়ে দ্রব্যের [প্রধানত পচনশীল দ্রব্যের] যোগান স্থির থাকে। তবে শীর্ষকালীন সময়ে উৎপাদনের মাত্রার পরিবর্তন করা যায় বলে ঐ সময়ে যোগান বাড়ানো বা কমানো যায়।

[5] দ্রব্যের প্রকৃতি ঃ যেসব দ্রব্য পুনরায় উৎপাদন করা যায় তাদের যোগান পরিবর্তনীয় হয়। কিন্তু, যে সমস্ত দ্রব্য পুনরায় উৎপাদন করা যায় না [যেমন, লিওনার্দোর আঁকা মোনালিসা] সেই সমস্ত দ্রব্যের যোগান সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক।

[6] কারিগরী অবস্থা ঃ বিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতির ফলে উন্নত ধরনের উৎপাদন কলা-কৌশলের ব্যাপক প্রয়োগে একদিকে যেমন উৎপাদন বেড়েছে, অপরদিকে তেমনি উৎপাদন ব্যয়ও হ্রাস পেয়েছে। ফলে দ্রব্যের যোগানেরও পরিবর্তন হয়েছে।

3.11. যোগান অপেক্ষক কাকে বলে? [What is Supply Function ?]

ওপরের আলোচনার ভিত্তিতে আমরা চাহিদা অপেক্ষকের (demand function) মতো যোগান অপেক্ষক (supply function) সমীকরণের সাহায্যে যোগান নির্ধারক বিষয়গুলো প্রকাশ করতে পারি :

$S_x = f(P_x, P_a....P_e, P_L.....P_O, T, G, S_t)$

S_x = X দ্রব্যের যোগান,

P_x = X দ্রব্যের দাম,

$P_a....P_e$ = X-এর সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের দাম,

$P_L....P_O$ = উৎপাদনের উপকরণগুলোর দাম,

T = সময়,

G = দ্রব্যের প্রকৃতি এবং

S_t = কারিগরী অবস্থা।

3.12. যোগান তালিকা এবং যোগানরেখা [Supply Schedule and Supply Curve]

আমরা চাহিদা তালিকার মতো ব্যক্তিগত ও বাজার যোগান তালিকা তৈরি করে থাকি। একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন দামে কোন বিক্রেতা যে পরিমাণ দ্রব্য বিক্রি করতে রাজি থাকে সেগুলোই ব্যক্তিগত যোগান তালিকার দ্বারা লিপিবদ্ধ করা হয়। কোন বিক্রেতা বিভিন্ন দামে কতটা X দ্রব্য বিক্রি করতে ইচ্ছুক যোগান তালিকা সেটাই দেখায়। আবার, প্রতিটি বিক্রেতার যোগানের সমষ্টিই বাজার যোগান বা মোট যোগান। প্রতিটি বিক্রেতার X দ্রব্যের যোগানের পরিমাণ যোগ করে আমরা বাজারের যোগান তালিকা পাই। দামের হ্রাস-বৃদ্ধিতে ব্যক্তিগত যোগানের মত বাজারের বা মোট যোগানেরও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। বিভিন্ন দামে ব্যক্তিগত যোগান ও বাজারের যোগানের পরিমাণের একটি কাল্পনিক (অথচ বাস্তবসম্মত) তালিকা দেওয়া হল।

সারণি 3.4 : ব্যক্তিগত ও বাজার যোগান তালিকা

X দ্রব্যের দাম	ব্যক্তিগত যোগানের পরিমাণ	বাজারের মোট যোগানের পরিমাণ
50 টাকা	1,000 কিলোগ্রাম	15 কুইন্টাল
25 ,,	600 ,,	13 ,,
15 ,,	400 ,,	9 ,,
10 ,,	100 ,,	4 ,,

3.4 নং সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, X দ্রব্যের দাম যত কমছে ততই বিক্রেতা ঐ দ্রব্যের যোগানও কমিয়ে দিচ্ছে। অনুরূপভাবে, দাম কমার ফলে বাজারের মোট যোগানও কমছে। সুতরাং, দাম ও যোগানের মধ্যে সম্পর্ক প্রত্যক্ষ। অন্যান্য বিষয় স্থির থাকলে দাম কমলে (বাড়লে) যোগান কমে (বাড়ে)। দাম ও যোগানের এই প্রত্যক্ষ সম্পর্ক যোগান নিয়মের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হয়।

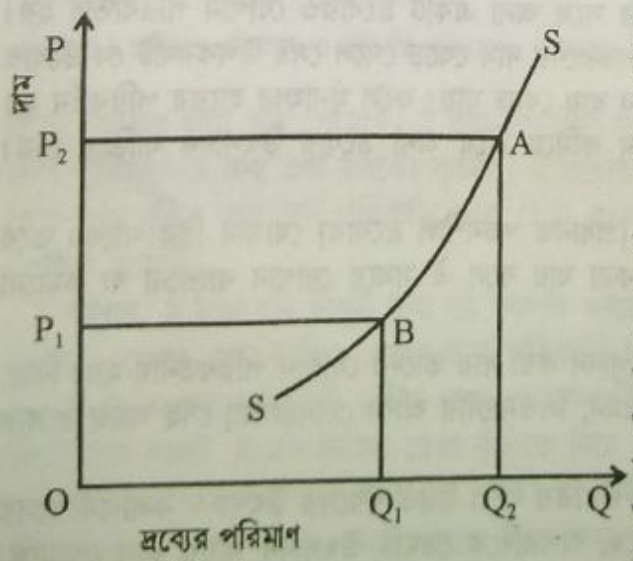

চিত্র 3.6 : যোগান রেখা

3.6 নং চিত্রে X দ্রব্যের যোগান রেখা দেখানো হয়েছে। দাম যখন OP_2 তখন বিক্রেতা OQ_2 পরিমাণ দ্রব্য বিক্রি করতে চায়। এখন দাম কমে OP_1 হলে যোগানের পরিমাণ কমে OQ_1 হবে। তাই X দ্রব্যের যোগানরেখা, SS ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে। অর্থাৎ, যোগান রেখার ঢাল ধনাত্মক। এখন বিভিন্ন দামে প্রতিটি বিক্রেতার যোগানরেখা যোগ করে আমরা বাজারের যোগানরেখা পাই। বাজারের যোগানরেখাও ব্যক্তিগত যোগানরেখার মতো ঊর্ধ্বমুখী।

3.13. যোগানরেখা ঊর্ধ্বমুখী হয় কেন? [Why is Supply Curve Upward Sloping?]

সাধারণত দুটি কারণে যোগানরেখা ঊর্ধ্বমুখী হয়।

(i) ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের নিয়মের কাজ করা ঃ ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপন্নের বিধির জন্য (স্বল্পকালীন) যোগানরেখা ঊর্ধ্বমুখী হয়ে থাকে। সাধারণত একটি নির্দিষ্ট মাত্রার পর উৎপাদনমাত্রা বাড়ানো হলে পরিবর্তনীয় উপাদানগুলোর বাড়তি উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায় বা ব্যয় বৃদ্ধি ঘটে। এই অবস্থায় দ্রব্যের দাম বেশি না হলে দ্রব্য উৎপাদিত হয় না বা বিক্রেতারা বাজারে যোগান দেয় না। অপরদিকে, দাম কম হলে তারা বাজারে যোগানের পরিমাণ কমিয়ে দেয়।

(ii) মুনাফা লাভের সম্ভাবনা ঃ উৎপাদক বা বিক্রেতা সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের আশায় দ্রব্যের যোগান দেয়। দাম বাড়লে একক প্রতি মুনাফা বেশি হয় বলে উৎপাদকেরা উৎপাদনের পরিমাণ ও যোগানের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। কম দামে মুনাফা কম হয় বা লোকসানের ভয় থাকে বলে যোগান কমে যায়। বস্তুত যোগানের পেছনে যে মূল শক্তি কাজ করে তা প্রান্তিক ব্যয়। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রান্তিক ব্যয় (অর্থাৎ এক একক অতিরিক্ত দ্রব্য তৈরি করতে যে অর্থ ব্যয় হয়) দ্রব্যের বাজার দামের চেয়ে কম হয় ততক্ষণ পর্যন্ত দ্রব্যটি যোগান দেওয়া লাভজনক। তবে উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে প্রান্তিক ব্যয়ও বৃদ্ধি পায় এবং দামের সংগে সমান হয়ে যায়। যখন তা হয় তখন দ্রব্যটির অতিরিক্ত একক উৎপাদন করা লাভজনক হয় না। এই অবস্থায় দাম বাড়লে উৎপাদন ও যোগান বাড়ে।

3.14. যোগানের নিয়মের ব্যতিক্রম [Exceptions to the Law of Supply]

যোগানের নিয়ম সবসময় ও সবক্ষেত্রে কাজ করে না। এমন কতকগুলো দ্রব্য আছে যাদের ক্ষেত্রে দামের হ্রাস-বৃদ্ধিতে যোগানের কোন পরিবর্তন ঘটে না। আবার, কখনো কখনো দাম বেড়ে গেলে যোগান কমে যায়। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলোতে যোগানের সূত্র কাজ করে না ঃ

[1] পুনরায় উৎপাদন করা যায় না এমন দ্রব্য ঃ যে সমস্ত দ্রব্য একবার উৎপাদিত হয়েছে অথচ পুনরায় উৎপাদন করা যাবে না, যে সমস্ত দ্রব্যের ক্ষেত্রে [যেমন, মোনালিসার ছবি] যোগানরেখা ঊর্ধ্বমুখী না হয়ে উল্লম্বরেখার সমান্তরাল হয়। এই সমস্ত দ্রব্যের ক্ষেত্রে যোগানরেখা সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক (perfectly inelastic) হয়। দাম যাই হোক না কেন [3.7 নং চিত্রে OP_1 বা OP_2] যোগানের পরিমাণ একই থাকে [OS পরিমাণ]।

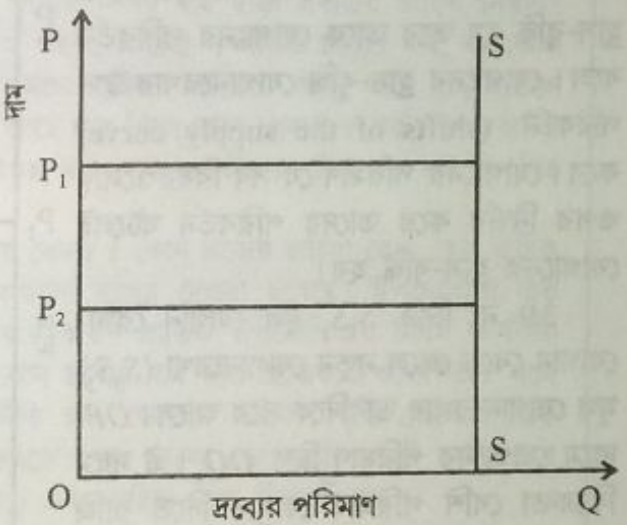

চিত্র 2.7 ঃ উল্লম্ব যোগানরেখা

সাধারণত, জমির যোগানরেখাও 3.7 চিত্রের মতো সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক হয়।

[2] শ্রমের বাজার ঃ অনেক ক্ষেত্রে দাম বাড়লে যোগান কমে ও দাম কমলে যোগান বাড়ে। শ্রমের বাজারে যোগান নিয়মটির এই ব্যতিক্রম দেখা যায়। শ্রমের দাম অর্থাৎ মজুরি বাড়লে আয় প্রভাব (income effect) এবং পরিবর্ত প্রভাবের (substitution effect) ফলে শ্রমের যোগান কমে। মজুরি বাড়লে শ্রমিকেরা বেশি কাজ করতে আগ্রহী হয়। এই সময়ে শ্রমিকেরা বিশ্রামের পরিবর্তে কাজ বেশি করে। এটা পরিবর্ত প্রভাব। অপরদিকে, মজুরি বৃদ্ধি পেলে শ্রমিকেরা অনেক সময় বেশিক্ষণ বিশ্রাম নিতে চায়। এই অবস্থায় তারা কম কাজ করে। এটা মজুরি বৃদ্ধির আয় প্রভাব। সুতরাং পরিবর্ত প্রভাবের জন্য শ্রমের যোগান বাড়ে ও আয় প্রভাবের জন্য শ্রমের যোগান কমে। 3.8 নং চিত্রে S_LS_L শ্রমের যোগানরেখা। OW_1 পর্যন্ত মজুরি বাড়লে শ্রমের যোগান বাড়ে। এই সময়ে পরিবর্ত প্রভাব আয় প্রভাবের চেয়ে বেশি শক্তিশালী বলে যোগানের নিয়মটি কার্যকরী হয়। OW_1-এর বেশি মজুরি হলে আয় প্রভাব পরিবর্ত প্রভাবের চেয়ে বেশি শক্তিশালী হয় বলে S_LS_L রেখা পশ্চাৎমুখী (backward bending) হয়েছে। এর অর্থ বেশি মজুরিতে শ্রমের যোগান কম।

[3] অসুবিধায় পড়ে বিক্রি করা দ্রব্য ঃ বিক্রেতা অনেক সময় অসুবিধায় পড়ে বা অর্থনৈতিক দুর্দশায় জর্জরিত হয়ে কম দামে দ্রব্যের যোগান বাড়িয়ে দেয়। অর্থনৈতিকভাবে দুর্দশাগ্রস্ত ভারতীয় চাষীরা তাদের

উৎপাদিত দ্রব্য অল্প দামে বিক্রি করতে বাধ্য হয়। এই সমস্ত ক্ষেত্রে যোগানের নিয়ম কার্যকরী হয় না।

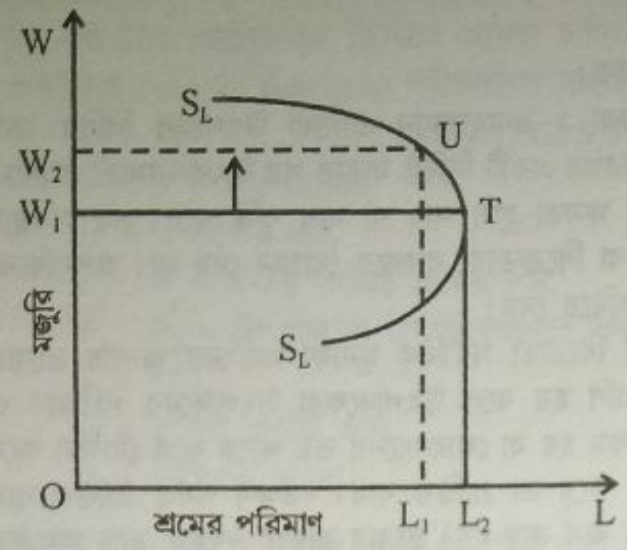

চিত্র 3.8 : পশ্চাৎমুখী যোগানরেখা

[4] ক্রমহ্রাসমান ব্যয়-বিশিষ্ট শিল্প : পরিশেষে, কোন প্রতিযোগিতামূলক শিল্পে দীর্ঘকালে যদি ক্রমহ্রাসমান ব্যয়ের নিয়ম কার্যকরী হয় তাহলে উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে গড় ব্যয় হ্রাস পাবে। এই অবস্থায় কম দামেও বেশি পরিমাণ দ্রব্য যোগান দেওয়া সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে শিল্পের দীর্ঘকালীন যোগানরেখা নিম্নমুখী হবে।

3.15. যোগানের পরিমাণের পরিবর্তন ও যোগানের পরিবর্তন [Change in Quantity Supplied and Change in Supply]

দাম ও যোগানের কার্যকারণ সম্পর্ক প্রত্যক্ষ—দাম বাড়লে যোগান বাড়ে ও দাম কমলে যোগান কমে। দাম পরিবর্তনের জন্য একই যোগান-রেখার ওপরে ও নিচে যোগানের পরিমাণের কমা-বাড়াকে যোগানের পরিমাণের পরিবর্তন বলে। একে যোগানের সম্প্রসারণ এবং সংকোচনও বলা হয়। সুতরাং, যোগানের পরিমাণের পরিবর্তন বলতে যোগান তালিকার (supply schedule) পরিবর্তন বা যোগানরেখার পরিবর্তন বোঝায় না।

অন্যদিকে, দাম একই থেকে যদি যোগানের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় তবে তাকে যোগানের পরিবর্তন বলে। যোগানের হ্রাস-বৃদ্ধি যোগানরেখার স্থান পরিবর্তন (shifts of the supply curve) করে। যোগানের পরিমাণ যে সব বিষয়গুলোর ওপর নির্ভর করে তাদের পরিবর্তন ঘটলেই যোগানের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়।

3.9 নং চিত্রে S_1S_1 মূল যোগান রেখা। যোগান বেড়ে গেলে নতুন যোগানরেখা (S_3S_3) মূল যোগানরেখার ডানদিকে সরে আসে। OP_1 দামে যোগানের পরিমাণ ছিল OQ_1। ঐ দামে বিক্রেতা বেশি পরিমাণ যোগান দিতে রাজি থাকায় যোগানের পরিমাণ বেড়ে হয় Q_3B। অপরদিকে, যোগান কমে গেলে নতুন যোগানরেখা (S_2S_2) মূল যোগানরেখার বাঁদিকে সরে আসে।

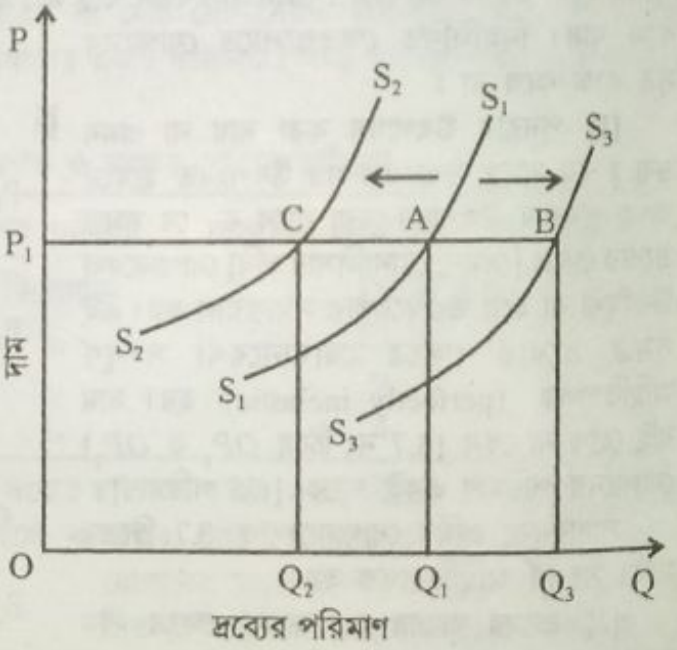

চিত্র 3.9 : যোগানের পরিবর্তন

যোগানের পরিবর্তনের (বা যোগানরেখার স্থান পরিবর্তনের) কারণ

যোগানের পরিমাণ যে সব বিষয়গুলোর ওপর নির্ভর করে সেগুলোর পরিবর্তন ঘটলে যোগানরেখার স্থান পরিবর্তন হয়। দ্রব্যের দাম ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ের পরিবর্তনে যোগানের পরিবর্তন ঘটে। আমরা জানি যে, [a] অন্যান্য দ্রব্যের (যেমন, চালের) দামের হ্রাস-বৃদ্ধিতে, [b] উৎপাদনের উপকরণের দামের হ্রাস-বৃদ্ধিতে এবং [c] উৎপাদনের কলাকৌশলের পরিবর্তনে কোন নির্দিষ্ট দ্রব্যের (যেমন গমের) যোগানের পরিবর্তন ঘটে। এছাড়া, [d] কর ব্যবস্থা যোগান পরিবর্তন আনে। কোন দ্রব্যের ওপর কর ধার্য করা হলে সেই দ্রব্যের দাম বাড়ে। এই অবস্থায় একই পরিমাণ যোগানের জন্য বেশি দাম দিতে হয়। করের হার কমিয়ে দিলে বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। অনুরূপভাবে, আমদানি শুল্কও (import duty) যোগানকে প্রভাবিত করে। [e] সাধারণত কৃষিজাত পণ্যের ক্ষেত্রে যোগান অনেকাংশে আবহাওয়ার ওপর

নির্ভরশীল। অনুকূল আবহাওয়ায় কৃষিপণ্যের উৎপাদন ও যোগান বেড়ে যায়। [f] পরিবহণের মাধ্যমের পরিবর্তনেও যোগানের পরিমাণে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে।

এই সমস্ত কারণে যোগানরেখা বাঁদিকে (ওপরের দিকে) ও ডানদিকে (নিচের দিকে) স্থান পরিবর্তন করে।

16

চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতা
(Elasticities of Demand and Supply)

The price elasticity of demand is expressed in terms of relative — that is, proportionate or percentage — changes in price and quantity demanded, not absolute changes in price and quantity demanded. E. Mansfield

অধ্যায়ের বিষয়বস্তু ও জিজ্ঞাসা

চাহিদার নিয়মের সংগে জড়িত আছে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা যা চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নামে পরিচিত, চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার সংজ্ঞা, প্রকারভেদ, বিভিন্ন প্রকারের স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ পদ্ধতি, চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কী কী বিষয়ের ওপর নির্ভর করে এবং ধারণাটি কিভাবে বাস্তবে প্রয়োগ করা যায় এই সব বিষয় নিয়ে এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই অধ্যায় পড়লে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া যাবে ঃ

1. চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলতে কি বোঝায়?
2. চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কত রকমের হয়?
3. কিভাবে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ করা যায়?
4. চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কি কি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে?
5. বাস্তব জগতের কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ধারণাটির প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়?

4.1. চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা [Elasticity of Demand]

চাহিদার নিয়ম থেকে আমরা জানতে পারি দামের পরিবর্তনের ফলে চাহিদার গতির পরিবর্তন হয়। চাহিদার নিয়মে বলা হয় যে, দাম কমলে চাহিদা বাড়ে এবং দাম বাড়লে চাহিদা কমে। কিন্তু দামের 'কতটা' পরিবর্তনের ফলে চাহিদার 'কতটা' পরিবর্তন হবে তা চাহিদার নিয়মের ব্যাখ্যায় পাওয়া যায় না। দামের পরিবর্তনের ফলে চাহিদার কতটা পরিবর্তন হয় চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা থেকে সেটি জানা যায়। এই প্রসঙ্গে 4.1 নং চিত্রটি দ্রষ্টব্য।

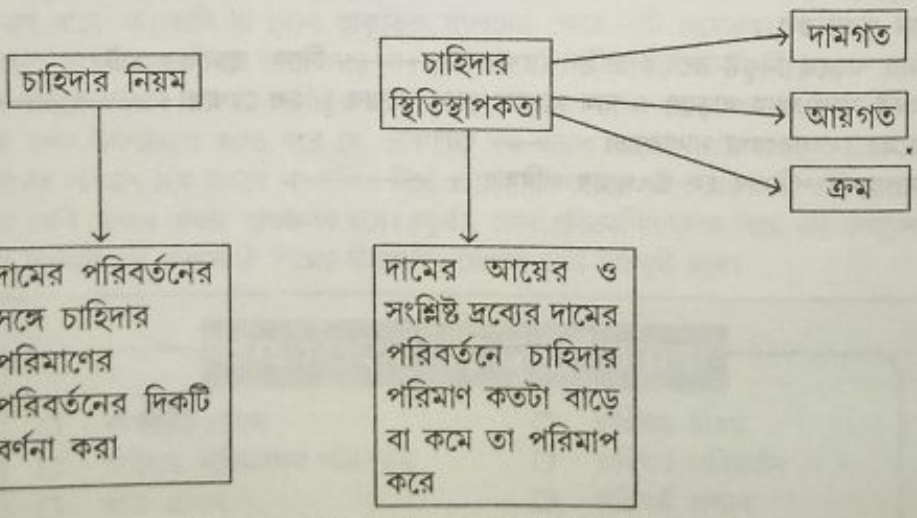

চিত্র 4.1 ঃ চাহিদার নিয়ম বনাম চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা

চাহিদা নির্ধারণ বিষয়গুলোর যে কোন একটির পরিবর্তনে কোন দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ কতটা সাড়া দেয় চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা সেটাই দেখায়। চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা সাধারণত তিন ধরনের হয়— [i] দামগত, [ii] আয়গত ও [iii] ক্রম স্থিতিস্থাপকতা। এর মধ্যে চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলতে আমরা চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতাকেই

বুঝি। ক্রেতার আয়, রুচি ও পছন্দ এবং সংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদির দাম স্থির থাকাকালীন কোন দ্রব্যের নিজের দামের পরিবর্তনে চাহিদার সাড়া দেওয়ার মাত্রা বা পরিবর্তনশীলতার মাত্রাকে চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতা বলে। [Price elasticity of demand is a measure of the degree of responsiveness of quantity demanded to price changes. —R.G. Lipsey] দাম পরিবর্তনের হারের সঙ্গে চাহিদার পরিবর্তনের হারের অনুপাতকে চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতা বলে। অর্থাৎ চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা হল দামের আপেক্ষিক পরিবর্তনের জন্য চাহিদার আপেক্ষিক পরিবর্তন। চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার সঠিক সংজ্ঞা হল দামের আনুপাতিক পরিবর্তনের তুলনায় চাহিদার আনুপাতিক পরিবর্তন।

এখন দেখা যাক, চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কিভাবে পরিমাপ করা যায়। ওপরের সংজ্ঞা অনুযায়ী,

$$\text{চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতা} = \frac{\text{চাহিদার শতকরা পরিবর্তন}}{\text{দামের শতকরা পরিবর্তন}}$$

$$= \frac{\dfrac{\text{চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন}}{\text{দামের শতকরা পরিবর্তন}} \times 100}{\dfrac{\text{দামের পরিবর্তন}}{\text{পুরোনো দাম}} \times 100}$$

$$= \frac{\dfrac{\text{চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন}}{\text{পুরোনো চাহিদার পরিবর্তন}}}{\dfrac{\text{দামের পরিবর্তন}}{\text{পুরোনো দাম}}}$$

প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার করে চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতা এভাবে প্রকাশ করা হয় ঃ

$$E_p = \frac{\dfrac{\Delta Q}{Q}}{\dfrac{\Delta P}{P}} = \frac{\Delta Q}{Q} \times \frac{P}{\Delta P} = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \times \frac{P}{Q}$$

যেখানে E_p = চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতার সহগ
ΔP = দামের চূড়ান্ত পরিবর্তন
ΔQ = চাহিদার পরিমাপের চূড়ান্ত পরিবর্তন
P = প্রাথমিক দাম
এবং Q = প্রাথমিক চাহিদার পরিমাণ।

দামের সঙ্গে চাহিদার বিপরীতমুখী সম্পর্ক আছে বলে চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতার সহগের (Coefficient of price elasticity of demand) মান সব সময় ঋণাত্মক হবে। অর্থাৎ ওপরের সূত্রে একটি ঋণাত্মক চিহ্ন (–) বসানো হয়। যেহেতু ঋণাত্মক মানের কোন অর্থনৈতিক তাৎপর্য নেই, তাই ওপরের সূত্রটির আগে একটি বিয়োগচিহ্ন (–) দিয়ে E_p-এর মান সর্বদা ধনাত্মক বলে ধরা হয়। এখানে E_p হল একটি চূড়ান্ত নম্বর (absolute number)। কারণ এটি হল দুটি শতাংশের (চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তনের শতাংশ এবং দামের পরিবর্তনের শতাংশ) অনুপাত। যদি E_p-এর মান 1-এর বেশি হয় তাহলে চাহিদা স্থিতিস্থাপক অর্থাৎ দাম যতটা হ্রাস পায় এর ফলে চাহিদার পরিমাণ তার চেয়ে বেশি বৃদ্ধি পায়। আর যদি E_p-এর মান 1-এর কম হয় তাহলে চাহিদা হল অস্থিতিস্থাপক এবং যদি E_p-এর মান 1 হয় তাহলে চাহিদা হল একক স্থিতিস্থাপক। এছাড়া চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতা আরো দুধরনের হতে পারে। তাই চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতা হল মোট পাঁচ ধরনের। এই পাঁচ ধরনের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নিয়ে আমরা এখন এক এক করে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব।

উদাহরণ ঃ দাম পরিবর্তনের আগে কোন দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ ছিল 100 একক; দাম যদি 25 টাকা বৃদ্ধি পায়, তবে চাহিদার পরিমাণ 5 একক হ্রাস পায়। চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতা 1-2 হলে, আগে দ্রব্যটির দাম কত ছিল?

উত্তর ঃ এখানে দামগত স্থিতিস্থাপকতা $(E_p) = 1.2 = -\left(\frac{-\Delta Q / Q}{\Delta P / P}\right)$

অর্থাৎ $1.2 = \frac{5}{25 \text{ টাকা}} \times \frac{P}{100}$

অথবা, $1.2 = \frac{5P}{2500 \text{ টাকা}}$

অথবা, $3000 = 5P$(বজ্রগুণন করে)

অথবা, $P = 600$ টাকা।

অর্থাৎ, দ্রব্যটির প্রারম্ভিক দাম ছিল 600 টাকা। উত্তরটি নির্ভুল কিনা তা এভাবে পরীক্ষা করা যায় ঃ

$$1.2 = \frac{5}{25} \times \frac{600}{100} = \frac{3000^{6}}{2500_{5}} .$$

4.1.1 চাহিদার পাঁচ প্রকারের দামগত স্থিতিস্থাপকতা [Five Types of Price Elasticity of Demand]

সাধারণত প্রায় সমস্ত দ্রব্যের ক্ষেত্রে দাম পরিবর্তনের হার ও চাহিদার পরিবর্তনের হার সমান হয় না। কোন কোন দ্রব্যের ক্ষেত্রে দামের সামান্য পরিবর্তনে চাহিদার পরিমাণে বিরাট পরিবর্তন হয়। আবার, অনেক দ্রব্যের ক্ষেত্রে দামের পরিবর্তনের ফলে চাহিদার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় না। এই কারণে চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতা বিভিন্ন প্রকারের হয়। এই প্রসঙ্গে আমরা স্থিতিস্থাপক চাহিদা ও অস্থিতিস্থাপক চাহিদার মধ্যে পার্থক্য দেখাব।

1. স্থিতিস্থাপক চাহিদা [Elastic Demand] ঃ দাম পরিবর্তনের হারের তুলনায় চাহিদার পরিমাণের অধিক হারে পরিবর্তন হলে তাকে স্থিতিস্থাপক চাহিদা বলে। যেমন, দামের 110% পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিমাণের 1.5% পরিবর্তন। কারণ এক্ষেত্রে দামগত স্থিতিস্থাপকতার মান (15%/10%)1-এর বেশি। সাধারণত, বিলাসদ্রব্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয়।

2. অস্থিতিস্থাপক চাহিদা [Inelastic Demand] ঃ দাম যে হারে পরিবর্তিত হয় চাহিদার পরিমাণ তার চেয়ে কম হারে পরিবর্তিত হলে সেই দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয়। যেমন, দাম 10% পরিবর্তিত হলে চাহিদার পরিমাণ যদি 1% পরিবর্তিত হয় তবে তাকে অস্থিতিস্থাপক চাহিদা বলে। কারণ এক্ষেত্রে E_p-এর মান 1-এর কম। সাধারণত, প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয়ে থাকে।

স্থিতিস্থাপক চাহিদা বনাম অস্থিতিস্থাপক চাহিদা (Elastic Demand vs. Inelastic Demand)

দুটি দ্রব্যের, যেমন X-দ্রব্য ও Y-দ্রব্যের চাহিদা-রেখা থেকে আমরা দেখতে পাই যে, চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। [4.2 নং চিত্রটি দ্রষ্টব্য।] আমরা দেখি যে, দাম OP_1 হলে X-দ্রব্য ও Y-দ্রব্য উভয়ের চাহিদা হল OQ_1। কিন্তু যখন উভয় দ্রব্যের দাম কমে OP_2 হয় তখন X-দ্রব্যের চাহিদা OQ_1 থেকে সামান্য বেড়ে হয় OQ_2। অপরদিকে Y-দ্রব্যের চাহিদা বেড়ে হয় OQ_3। যেহেতু Y-দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধির পরিমাণ X-দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধির চেয়ে অনেক বেশি $(Q_1Q_3 > Q_1Q_2)$ তাই Y-দ্রব্যের চাহিদা X-দ্রব্যের চাহিদার চেয়ে বেশি স্থিতিস্থাপক। এছাড়া আরো তিন ধরনের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা দেখা যাবে।

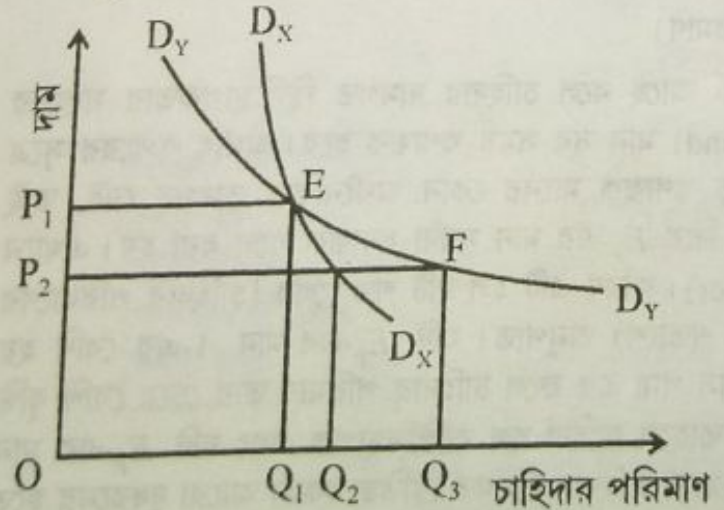

চিত্র 4.2 ঃ স্থিতিস্থাপক ও অস্থিতিস্থাপক চাহিদা

3. একক স্থিতিস্থাপক চাহিদা [Unitary Elasticity of Demand] ঃ দাম পরিবর্তনের হার ও চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তনের হার সমান হলে তাকে একক স্থিতিস্থাপক চাহিদা বলে। যেমন, দাম যদি 10% হারে পরিবর্তিত হয় ও তার ফলে চাহিদার পরিমাণেরও 10% পরিবর্তন ঘটে, তবে তাকে সমহার

বা একক স্থিতিস্থাপক চাহিদা বলে। অর্থাৎ চাহিদার গুণগত স্থিতিস্থাপকতার বা E_p-এর মান 1-এর সমান হয়। এক্ষেত্রে, দ্রব্যটির দামগত চাহিদা হল একক স্থিতিস্থাপক।

4. সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক চাহিদা [Perfectly Elastic Demand] ঃ দামের সামান্য পরিবর্তনের ফলে চাহিদার অসীম পরিবর্তনকে সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক চাহিদা বলে। দাম যদি খুব সামান্য কমে এবং চাহিদা যদি ভীষণ বেড়ে যায় অথবা, দামের সামান্য বৃদ্ধিতে যদি চাহিদা শূন্য হয় তখন তাকে সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক চাহিদা বলে। 4.3 নং চিত্র PD চাহিদা রেখা সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক। চাহিদার পরিমাণ যাই হোক না কেন, দামের যে কোন পরিবর্তন ঘটলে চাহিদার পরিবর্তন অসীম হয়। এক্ষেত্রে চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতার মান অসীম হয় (infinite অর্থাৎ $E_p \to \infty$)। বাস্তবে, এ ধরনের চাহিদা রেখা সাধারণত দেখা যায় না। তবে একমাত্র পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে উৎপাদকের কাছে তার দ্রব্যের চাহিদারেখা বা গড় আয় রেখা অনুভূমিক অক্ষের সমান্তরাল হয়।

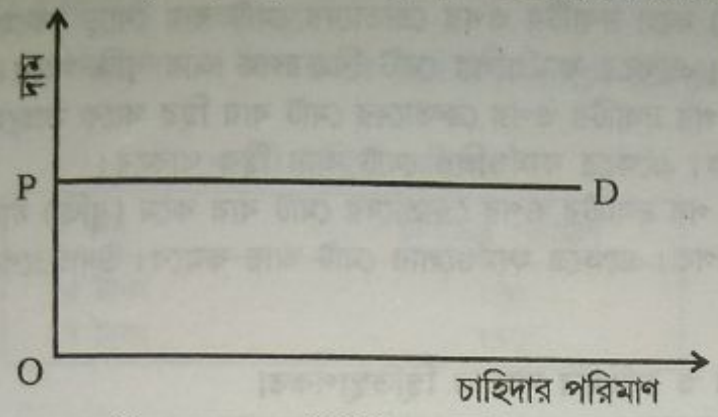

চিত্র 4.3 ঃ সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক চাহিদা-রেখা

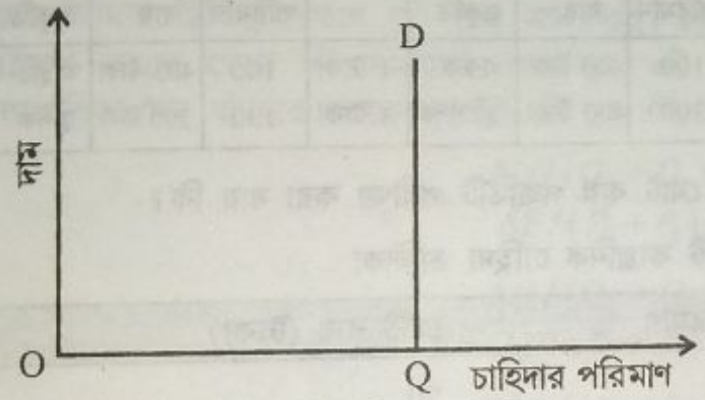

চিত্র 4.4 ঃ সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক চাহিদারেখা

5. সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক চাহিদা [Perfectly Inelastic Demand] ঃ দামের পরিবর্তনের (সামান্য বা বেশি) ফলে চাহিদার পরিমাণের যদি কোন পরিবর্তন না হয় তবে চাহিদা সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক হয়। 4.4 নং চিত্রে এই রকম সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক একটি চাহিদারেখা আঁকা হয়েছে। এক্ষেত্রে দাম যাই হোক না কেন চাহিদার পরিমাণ সব সময়েই OQ থাকে। তাই, এক্ষেত্রে চাহিদারেখা উল্লম্ব অক্ষের সমান্তরাল—অর্থাৎ চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতার মান শূন্য। এই ধরনের চাহিদা রেখাও বাস্তবে চোখে পড়ে না।

মনে রাখার বিষয়

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার ভিন্ন ভিন্ন মান ঃ

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার মান শূন্য থেকে অসীমের মধ্যে থাকতে পারে। স্থিতিস্থাপকতার মান যদি 1-এর বেশি হয় ($E_p > 1$) তবে চাহিদা স্থিতিস্থাপক, 1-এর কম হলে ($E_p < 1$) চাহিদা অস্থিতিস্থাপক, 1-এর সমান হলে ($E_p = 1$) চাহিদা একক স্থিতিস্থাপক, অসীম হলে ($E_p \to \infty$), চাহিদা সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক ও শূন্য হলে ($E_p = 0$) চাহিদা সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক।

4.1.2 চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ [The Measurement of Price Elasticity of Demand]

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বা চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপের জন্য তিনটি পদ্ধতি প্রচলিত আছে ঃ [a] মোট ব্যয় পদ্ধতি [total outlay method], [b] বৃত্তখণ্ডের স্থিতিস্থাপকতার [arc elasticity of demand] পদ্ধতি এবং [c] বিন্দুগত স্থিতিস্থাপকতার পদ্ধতি [point elasticity method]। এই তিনটি পদ্ধতি নিয়ে এখন এক এক করে আলোচনা করা যেতে পারে।

[a] মোট ব্যয় পদ্ধতি [The Total Outlay Method] ঃ কোন দ্রব্যের দাম পরিবর্তনের ফলে দ্রব্যটির ওপর ভোক্তাদের মোট ব্যয়ের পরিবর্তনের থেকে চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ করা যায়। কোন দ্রব্যের ওপর ভোক্তাদের ব্যয় হল দ্রব্যের দাম ক্রয়ের পরিমাণ অথবা $TO = P \times Q$. এটি আবার উৎপাদন প্রতিষ্ঠান বা ফার্মের বিক্রয়লব্ধ আয় (রেভেনিউ)। কারণ ভোক্তাদের যা ব্যয় ফার্মের তা আয়। অর্থাৎ, দাম পরিবর্তনের আগে ও পরে কোন দ্রব্য ক্রয় করতে ক্রেতারা যে মোট ব্যয় করে

তার তুলনা করে বলা যায় যে, দ্রব্যটির চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতার মান একের সমান না একের বেশি, না একের কম।

এই পদ্ধতি সম্পর্কে তিনটি পয়েন্ট মনে রাখতে হবে ঃ

1. যদি কোন দ্রব্যের দাম কমার (বৃদ্ধির) ফলে দ্রব্যটির ওপর ক্রেতাদের মোট ব্যয় বেড়ে (কমে) যায় তাহলে দ্রব্যটির চাহিদা হবে স্থিতিস্থাপক। এক্ষেত্রে ফার্মগুলির মোট বিক্রয়লব্ধ আয় বৃদ্ধি পাবে।

2. যদি কোন দ্রব্যের দাম কমার (বৃদ্ধির) পর দ্রব্যটির ওপর ক্রেতাদের মোট ব্যয় স্থির থাকে তাহলে দ্রব্যটির দামগত চাহিদা হল একক স্থিতিস্থাপক। এক্ষেত্রে ফার্মগুলির মোট আয় স্থির থাকবে।

3. যদি কোন দ্রব্যের দাম কমার (বৃদ্ধির) পর দ্রব্যটির ওপর ক্রেতাদের মোট ব্যয় কমে (বৃদ্ধি) যায় তাহলে দ্রব্যটির দামগত চাহিদা হল অস্থিতিস্থাপক। এক্ষেত্রে ফার্মগুলোর মোট আয় কমবে। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে বোঝানো যেতে পারে।

সারণি 4.1. ঃ মোট ব্যয় ও চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতা

দাম	চাহিদার পরিমাণ	মোট ব্যয়	চাহিদার প্রকৃতি	দাম	চাহিদার পরিমাণ	মোট ব্যয়	চাহিদার প্রকৃতি	দাম	চাহিদার পরিমাণ	মোট ব্যয়	চাহিদার প্রকৃতি
4 টাকা	100	400 টাকা	স্থিতিস্থাপক	4 টাকা	100	400 টাকা	একক	4 টাকা	100	400 টাকা	অস্থিতি-
1 টাকা	150	450 টাকা		3 টাকা	200	400 টাকা	স্থিতিস্থাপক	3 টাকা	130	390 টাকা	স্থাপক

উদাহরণ ঃ নিচের চাহিদা তালিকা থেকে মোট ব্যয় পদ্ধতিটি পরীক্ষা করা যায় কি?

সারণি 4.2 ঃ একটি কাল্পনিক চাহিদা তালিকা

দাম (টাকা)	চাহিদার পরিমাণ	মোট ব্যয় (টাকা)	
10	9	90	স্থিতিস্থাপক
8	15	120	একক স্থিতিস্থাপক
6	20	120	অস্থিতিস্থাপক
4	25	100	

উত্তর ঃ এক্ষেত্রে আমরা দেখি যে, দাম 10 টাকা থেকে কমে 8 টাকা হলে দ্রব্যটির ওপর মোট ব্যয় বাড়ছে। কাজেই চাহিদা এই স্তরে স্থিতিস্থাপক। এরপর দাম যদি কমে 6 টাকা হয় তাহলে মোট ব্যয় একই থাকে (120 টাকা)। দামের এই পরিবর্তনে চাহিদা হল একক স্থিতিস্থাপক। পরিশেষে দাম আরো কমে যখন 4 টাকা হয় তখন মোট ব্যয় 120 টাকা থেকে কমে 100 টাকা হয়।

এক্ষেত্রে চাহিদা হল অস্থিতিস্থাপক। সুতরাং ওপরের চাহিদা সূচী (তালিকা) থেকে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপের মোট ব্যয় পদ্ধতিটি পরীক্ষা করা যায়।

উদাহরণ ঃ ধরা যাক, কোন দ্রব্যের দাম 5 টাকা এবং চাহিদার পরিমাণ হল 100 একক। দ্রব্যটির দাম হঠাৎ কমে 4 টাকা হল। দ্রব্যটির চাহিদা স্থিতিস্থাপক হতে হলে চাহিদার পরিমাণ ন্যূনতম কত ইউনিট হওয়া দরকার?

উত্তর ঃ আমরা জানি যে, চাহিদা স্থিতিস্থাপক হতে হলে দ্রব্যটির ওপর ক্রেতাদের মোট ব্যয় স্থির থাকতে হবে। এক্ষেত্রে শুরুতে দ্রব্যটির ওপর মোট ব্যয় হল 5 টাকা × 100 = 500 টাকা। এখন দাম কমে 4 টাকা হলে এবং দ্রব্যটির চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে 125 একক হলে দ্রব্যটির ওপর ক্রেতাদের মোট ব্যয় হল 5 টাকা × 100 = 500 টাকা। এখন দাম কমে 4 টাকা হলে এবং দ্রব্যটির চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে 125 একক হলে দ্রব্যটির ওপর ক্রেতাদের মোট ব্যয় একই থাকবে অর্থাৎ চাহিদা একক স্থিতিস্থাপক হবে। তাই দ্রব্যটির চাহিদার পরিমাণ অন্তত 126 ইউনিট হতে হবে যাতে এর চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয়।

[b] বৃত্তখণ্ডের স্থিতিস্থাপকতা [Arc Elasticity of Demand] ঃ চাহিদা রেখা সরলরৈখিক না হয়ে যদি বক্র হয় তাহলে তার একটি অংশের বা বৃত্তখণ্ডের ওপর চাহিদা স্থিতিস্থাপকতার যে পরিমাপ করা হয় তাকে বৃত্তখণ্ডের স্থিতিস্থাপকতা বলে। বক্ররৈখিক চাহিদা রেখার ওপর যদি দুটি বিন্দু খুব কাছাকাছি

না থেকে কিছুটা দূরে থাকে, তাহলে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। তাছাড়া এই পদ্ধতি ব্যবহার করার আর একটি কারণ আছে। শতাংশের পরিবর্তন অনেক সময় বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। দাম হ্রাস পেলে আমরা স্থিতিস্থাপকতার একটি মান পাই, আর দাম বৃদ্ধি পেলে অন্য একটি মান পাই। নিচের চাহিদা তালিকাটি থেকে বিষয়টি বোঝা যাবে।

এক্ষেত্রে দাম 4 টাকা থেকে কমে 3 টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ 100 একক থেকে বেড়ে 150 একক হবে। এক্ষেত্রে দাম 25% হ্রাস পাচ্ছে আর এর ফলে চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে 50%। কাজেই চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার মান হল 2 অর্থাৎ এখন চাহিদা স্থিতিস্থাপক বলা যায়। দ্রব্যটির প্রারম্ভিক দাম 3 টাকা হয় এবং চাহিদার পরিমাণ হল 150 একক। এখন যদি দাম বেড়ে 4 টাকা হয় এবং এর ফলে চাহিদার পরিমাণ কমে 100 একক হয় তাহলে, চাহিদা হবে একক স্থিতিস্থাপক। সুতরাং একই চাহিদা সূচীর ক্ষেত্রে আমরা স্থিতিস্থাপকতার দুটি ভিন্ন মান পাই। চাহিদা একটি বৃত্তখণ্ডের ওপর স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ করতে গেলে এই সমস্যাটি দেখা হয়। এই সমস্যার সমাধান করতে হলে একটু নতুন (সংশোধিত) সূত্র ব্যবহার করতে হবে। সূত্রটি হল এই রকম ঃ

একটি চাহিদা তালিকা

দাম	চাহিদার পরিমাণ
4 টাকা	100
3 টাকা	150

22

$$E_p = \frac{\Delta Q/(Q_0+Q_1)+2}{\Delta P/(P_0+P_1)+2}$$

$$= \frac{\Delta Q/(Q_0+Q_1)}{\Delta P/(P_0+P_1)}$$

$$= \frac{50/(100+150)}{1/(4+3)} = 1.4$$

অর্থাৎ চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার চূড়ান্ত মান (absolute value) হল 1.4 যা 2 এবং 1-এর মধ্যে থাকে। এই সূত্রটি ব্যবহার করা হলে মোটামুটি নির্ভুলভাবে E_p-এর মান নির্ণয় করা যায়। এর কারণ হল এই যে, সূত্রটি দাম ও চাহিদার পরিমাণ দুটির গড়ের ওপর ভিত্তিশীল। তাই দাম কমলে বা বাড়লে এর মান একই হবে এবং উভয়ক্ষেত্রেই নির্ভুল হবে।

[c] চাহিদার বিন্দুজ দাম স্থিতিস্থাপকতা [Point Price Elasticity of Demand] ঃ চাহিদা-রেখার কোন নির্দিষ্ট বিন্দুতে চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতার ধারণাটি হল চাহিদার বিন্দুজ স্থিতিস্থাপকতার ধারণা। চাহিদার বিন্দুজ স্থিতি-স্থাপকতা পরিমাপ করার একটি সহজ জ্যামিতিক পদ্ধতি রয়েছে। 4.5 নং চিত্রে তা ব্যাখ্যা করা হল।

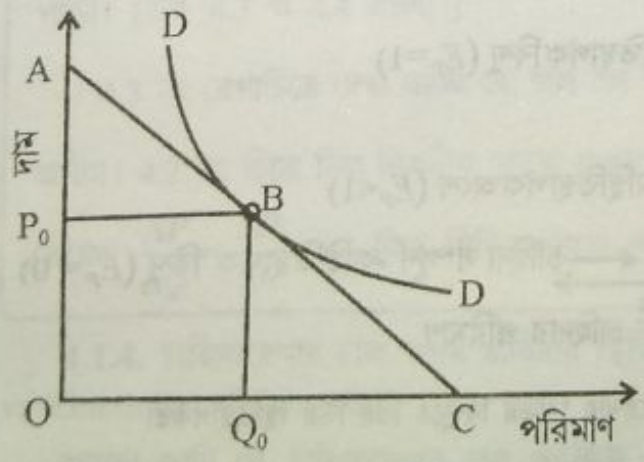

চিত্র 4.5 ঃ চাহিদার বিন্দুজ স্থিতিস্থাপকতা

এখানে DD হল কোন একটি দ্রব্যের চাহিদা-রেখা। ধরা যাক, চাহিদারেখার একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে (যেমন, B বিন্দুতে) আমরা স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করতে চাই। এক্ষেত্রে B বিন্দু দিয়ে একটি স্পর্শক টানতে হবে। এখানে AC হল একটি স্পর্শক। এখন স্পর্শকটির নিচের অংশকে (BC) ওপরের অংশ (AB) দিয়ে ভাগ দিলেই আমরা একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে অর্থাৎ B বিন্দুতে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ করতে পারব। এটি হল কোন নির্দিষ্ট দামে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করার পদ্ধতি।

কোন সরলরেখাবিশিষ্ট চাহিদারেখার ক্ষেত্রে বিন্দুজ স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ [Measuring Price Elasticity on a Straight Line Demand Curve]

যদি চাহিদা রেখাটি একটি সরলরেখা হয় তাহলে আরো সহজে এর যে কোন একটি বিন্দুতে চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করা যায়। 4.6 নং চিত্রে বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বোঝানো হয়েছে। এক্ষেত্রে B বিন্দু থেকে কোন স্পর্শক টানার দরকার নেই। কারণ স্পর্শকটি চাহিদা রেখার সঙ্গে মিশে যাবে। তাই এক্ষেত্রে BC অংশকে AB অংশ দিয়ে ভাগ দিলেই আমরা একটি নির্দিষ্ট দামে (অর্থাৎ চাহিদা রেখার একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে) অতি সহজে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ করতে পারব। এই পদ্ধতিটি যে সঠিক তা এভাবে প্রমাণ করা যায়।

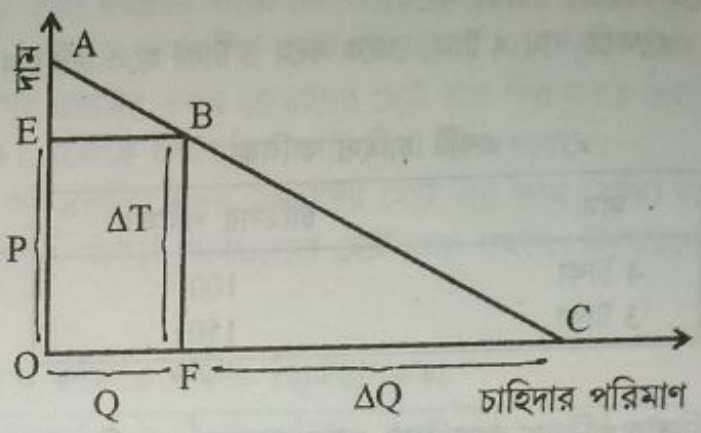

চিত্র 4.6 ঃ জ্যামিতিক পদ্ধতির সাহায্যে চাহিদার বিন্দুজ স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ

চাহিদা রেখার B বিন্দুতে $P = EO. Q = OF$, $\Delta P = BF$ এবং $\Delta Q = FC$.

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার সূত্রটি হল ঃ $E_p = \dfrac{\Delta Q / Q}{\Delta P / P} = \dfrac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \dfrac{P}{Q} = \dfrac{FC}{BF} \cdot \dfrac{EO}{OF}$

$= \dfrac{FC}{OF} = \dfrac{BC}{CA}$ [সদৃশ ত্রিভুজের গুণ অনুসারে (by the property of similar triangles)]

[ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ঃ যদি প্রশ্ন থাকে — **একটি নির্দিষ্ট দামে কিভাবে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ করবে**— তাহলে এই পদ্ধতির কথা লিখতে হবে।]

4.1.3. চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতার মান অনুসারে চাহিদা-রেখার বিভিন্ন অংশের (বৃত্তখণ্ডের) স্থিতিস্থাপকতার শ্রেণীবিভাগ [Classification of Different Segments of the Same Demand Curve on the Basis of Price Elasticity of Demand]

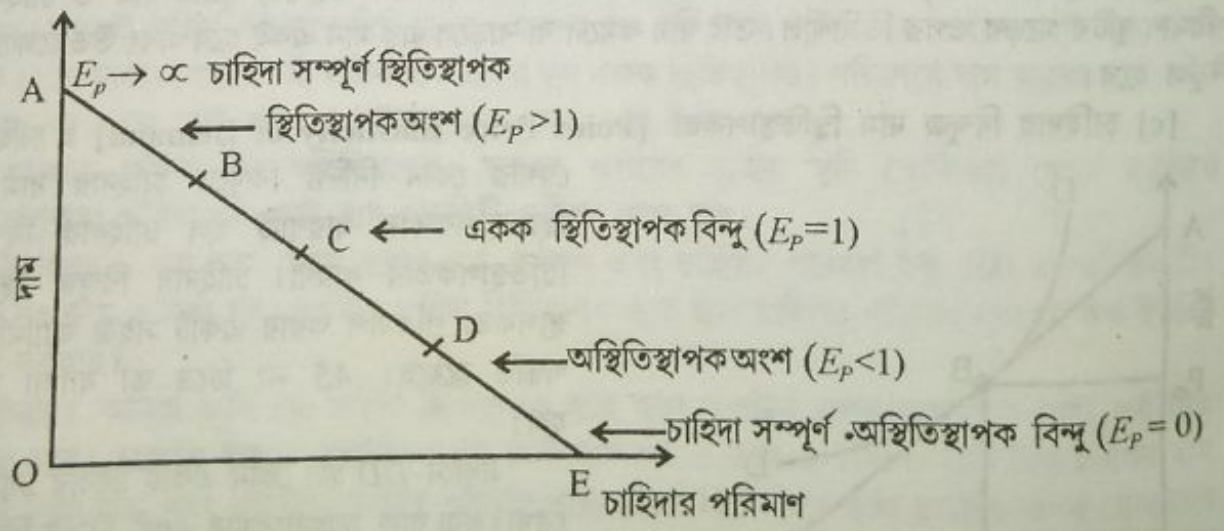

চিত্র 4.7 ঃ একটি সরলরেখাবিশিষ্ট চাহিদা রেখার বিভিন্ন বিন্দুতে ভিন্ন ভিন্ন স্থিতিস্থাপকতা

ওপরে উল্লিখিত সূত্রের ওপর ভিত্তি করে আমরা সরল চাহিদারেখা (straight line demand curve) বিভিন্ন বিন্দুতে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করতে পারি। 4.7 নং চিত্রের সাহায্যে তা দেখানো হল।

4.7 নং চিত্রের

[i] A বিন্দুতে চাহিদা সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক। কারণ $E_P = \frac{AE}{O} = \infty$.

[ii] B বিন্দুতে চাহিদা স্থিতিস্থাপক। কারণ $E_P = \frac{BE}{AB} > 1$.

[iii] C বিন্দুতে চাহিদা একক স্থিতিস্থাপক। কারণ $E_P = \frac{CE}{CA} = 1$.

[iv] D বিন্দুতে চাহিদা অস্থিতিস্থাপক। কারণ $E_P = \frac{DE}{AE} < 1$.

[v] E বিন্দুতে চাহিদা সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক। কারণ $E_P = \frac{O}{AE} = O$.

এ থেকে বোঝা যায় যে কোন সরলরেখাবিশিষ্ট চাহিদা রেখার মধ্যবর্তী বিন্দুতে $E_P=1$। কারণ AOE কোণটি হল 90 মাত্রার। সুতরাং এখান দিয়ে একটি 45 মাত্রার সরলরেখা টানলে সেটি AE চাহিদারেখার মধ্যবর্তী বিন্দু (mid-point) দিয়ে যাবে। C বিন্দুটি হল চাহিদা-রেখার একক স্থিতিস্থাপক বিন্দু। এর বাঁদিকের অংশটি হল চাহিদার স্থিতিস্থাপক অংশ যার ডানদিকের অংশটি হল চাহিদারেখার অস্থিতিস্থাপক অংশ। আর A বিন্দুতে চাহিদা রেখাটির সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক বিন্দু। পরিশেষে E বিন্দুটি হল চাহিদারেখার সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক বিন্দু। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার মান অসীম থেকে শুরু করে ক্রমশ কমতে কমতে অবশেষে শূন্যে এসে পৌঁছায়। কিভাবে এটি হয় তা আমরা 4.7 নং চিত্রে দেখলাম। কিন্তু এটি কেন হয় তা আমরা জানি না। জানতে হলে চাহিদারেখার ঢাল ও স্থিতিস্থাপকতার মধ্যে পার্থক্য বুঝতে হবে। এই পার্থক্যের ভিত্তিতে আমরা ব্যাখ্যা করব কেন চাহিদারেখা ধরে বাঁদিক থেকে ডানদিকে নামলে স্থিতিস্থাপকতার মান ক্রমশ কমতে থাকে।

অর্থনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি

একক স্থিতিস্থাপকতাবিশিষ্ট চাহিদারেখা ঃ চাহিদারেখাটি যদি **একটি সমপরাবৃত্ত (rectangular hyperbola)** হয় তা হলে ঢাল সবক্ষেত্রে পৃথক হবে কিন্তু স্থিতিস্থাপকতা প্রতিটি বিন্দুতে 1-এর সমান হবে। কারণ এই রেখাটি যে কোন বিন্দু থেকে স্পর্শক টানলে এবং স্পর্শকের নিচের অংশ দিয়ে ওপরের অংশ ভাগ করলে যে মান পাওয়া যাবে তা সবক্ষেত্রেই এককের সমান হবে।

কেবলমাত্র দুটি বিশেষ ক্ষেত্রে চাহিদার ঢাল থেকে স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক চাহিদার ও সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক চাহিদার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। [চিত্র 4.3 ও 4.4 দ্রষ্টব্য।]

4.3 নং রেখাচিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, ঢাল হল শূন্য কারণ $\frac{\Delta P}{\Delta Q} = \frac{0}{\Delta Q} = 0$. কিন্তু স্থিতিস্থাপকতা অসীম। 4.2 নং চিত্রে ঠিক বিপরীত অবস্থা দেখানো হয়েছে। এখানে চাহিদারেখার ঢাল হল অসীম। (কারণ $\frac{\Delta P}{\Delta Q} = \frac{\Delta P}{0} = \infty$) কিন্তু স্থিতিস্থাপকতা শূন্য।

4.1.4. চাহিদারেখার ঢাল বনাম চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা [The Slope of a Demand Curve vs Elasticity of Demand]

আমরা জানি যে, চাহিদারেখার ঢাল ঋণাত্মক, কারণ দাম ও চাহিদার মধ্যে সম্পর্ক বিপরীতমুখী। এখন প্রশ্ন হল ঃ চাহিদারেখার ঢাল বলতে কি বোঝায়? চাহিদারেখার ঢাল বলতে চাহিদার পরিমাণ ও দামের চূড়ান্ত (absolute) পরিবর্তনের অনুপাতকেই বোঝায়।

অর্থাৎ চাহিদা রেখার ঢাল $= \frac{\text{দামের চূড়ান্ত পরিবর্তন}}{\text{চাহিদার পরিমাণের চূড়ান্ত পরিবর্তন}}$।

সাংকেতিক ভাষায়, চাহিদা-রেখার ঢাল $= \frac{\Delta P}{\Delta Q}$

এখানে P = দামের চূড়ান্ত পরিবর্তন এবং

ΔQ = চাহিদার পরিমাণের চূড়ান্ত পরিবর্তন।

একটি জ্যামিতিক দৃষ্টান্তের সাহায্যে চাহিদা রেখার ঢালটি বোঝানো যেতে পারে। 4.8 নং চিত্রে DD হল একটি সরলরৈখিক চাহিদা-রেখা। এর ওপর A এবং B দুটি বিন্দু নেওয়া হয়েছে। A বিন্দু অনুযায়ী OP_1 দামে দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ হল OP_1 এবং B বিন্দু অনুযায়ী OP_2 দামে দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ হল OQ_2। সুতরাং দামের পরিবর্তন (ΔP) হল P_1P_2 অথবা AB-র সমান এবং চাহিদার পরিবর্তন (ΔQ) হল Q_1Q_2 অথবা BC-র সমান। সুতরাং চাহিদারেখার ওপর ঐ অংশে ঢাল হল । সুতরাং দেখা গেল যে, চাহিদারেখার ঢাল দাম ও চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তনের চূড়ান্ত (অনাপেক্ষিক) পরিবর্তনের পরিমাপ করে। এখানে DD চাহিদারেখার ঢাল হল ঋণাত্মক এবং এই রেখার প্রতিটি অংশেই ঢাল সমান। তবে চাহিদারেখা সরলরৈখিক না হয়ে বক্র আকৃতির হলে চাহিদারেখার প্রতিটি অংশে ঢাল সমান হয় না।

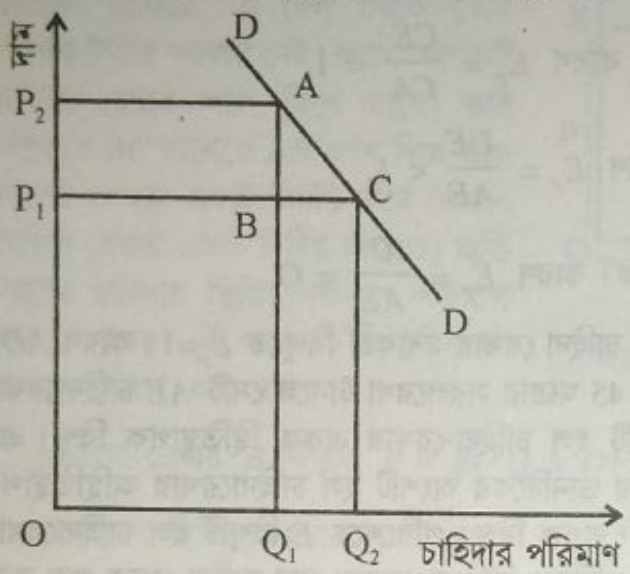

চিত্র 4.8 ঃ চাহিদারেখার ঢাল ও স্থিতিস্থাপকতা

অপরদিকে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলতে দাম ও চাহিদার আপেক্ষিক (শতাংশের) পরিবর্তনকে বোঝায়। অর্থাৎ

$$E_P = \frac{\Delta Q/Q \times 100}{\Delta P/P \times 100} = \frac{\Delta Q/Q}{\Delta P/P} = \frac{\Delta Q}{Q} \times \frac{P}{\Delta P} = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \times \frac{P}{Q}$$

$$\text{অথবা, } E_P = \frac{1}{\text{চাহিদা রেখার ঢাল}} \cdot \frac{P}{Q} = \frac{1}{\frac{\Delta P}{\Delta Q}} \cdot \frac{P}{Q} = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P}{Q}.$$

অর্থাৎ চাহিদারেখার ঢালের অন্যোন্যককে (reciprocal) প্রারম্ভিক দাম ও চাহিদার পরিমাপের অনুপাত (the initial price-quantity ratio) দিয়ে গুণ করলে তবেই আমরা চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার মান নির্ণয় করতে পারব।

তাই চাহিদারেখার ঢাল ও চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা একই অর্থে ব্যবহার করা ঠিক নয়। যদি এই দুটি ধারণা এই অর্থে ব্যবহৃত হত তাহলে সরলরৈখিক চাহিদারেখার প্রতিটি বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতার মান একই হত। কারণ ঐ ধরনের চাহিদা রেখার ঢাল প্রতিটি বিন্দুতেই সমান।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, চাহিদারেখার ঢাল চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নির্ধারণের ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। চাহিদা রেখার ঢালের সঙ্গে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার সম্পর্ক থেকে আরও জানা যায় যে, চাহিদারেখাটি যদি সরলরৈখিক হয় তাহলে সেই রেখার ঢাল সর্বত্র সমান থাকে। কিন্তু প্রারম্ভিক দাম ও চাহিদার পরিমাপের অনুপাতের (P/Q) মান প্রত্যেক বিন্দুতে বিভিন্ন হওয়ার জন্য সরলরৈখিক চাহিদারেখার ওপর প্রত্যেক বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতার মান ভিন্ন ভিন্ন হয়।

একটি সহজ উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বোঝানো যেতে পারে। 4.9 নং চিত্রটি দ্রষ্টব্য। চাহিদা-রেখা AB অংশের ঢাল হল $\frac{\Delta P}{\Delta Q} = \frac{-2}{10} = \frac{1}{-5}$ আর KL অংশের ঢালও ঐ একই ঃ $\frac{-2}{10} = \frac{1}{-5}$। তবে

AB অংশে চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতার চূড়ান্ত মান (absolute value) হল $E_P = \frac{10\%}{100\%} = 10$।

এর কারণ দাম সামান্য (10%) হ্রাস পাওয়ায় চাহিদার পরিমাণ অনেকটা (100%) বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ চাহিদা হল ভীষণভাবে স্থিতিস্থাপক। অপরদিকে চাহিদা-রেখার KL অংশে দাম 50% হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও চাহিদার পরিমাণ মাত্র 10% বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং $E_P = {}^1/_5$ অর্থাৎ চাহিদা ভীষণভাবে অস্থিতিস্থাপক। এর কারণ সহজেই অনুমান করা যায়। যখন কোন দ্রব্যের প্রারম্ভিক দাম খুব বেশি হয় তখন প্রারম্ভিক চাহিদার পরিমাণ কম হয়। এই অবস্থায় দাম সামান্য কমলে চাহিদার পরিমাণ অনেকটা বেড়ে যায়। ফলে চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয়। যেমন, শীতের সময় যখন কোন সবজির — যেমন টমাটোর দাম খুব বেশি থাকে তখন অনেকেই অল্প করে টমাটো কেনেন। কারণ তাঁরা জানেন যে, খুব শীঘ্রই দাম কমবে। তখন তাঁরা বেশি করে কিনবেন বলে দাম কমার অপেক্ষায় থাকেন। তাই দাম সামান্য কমলেই (আমাদের উদাহরণের 20 টাকা থেকে 18 টাকা) চাহিদার পরিমাণ সমানুপাতিক হারের চেয়ে বেশি বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ এই অবস্থার চাহিদা স্থিতিস্থাপক। অপরদিকে যখন প্রারম্ভিক দাম খুব কম ও চাহিদার পরিমাণ খুব বেশি হয় তখন দাম অনেকটা হ্রাস পেলেও চাহিদা বিশেষ বাড়ে না। এই অবস্থায় চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয়। যেমন, শীতকালের শেষে যখন গরম বাড়তে থাকে তখন টমাটোর বাজারে চাহিদার পরিপূর্ণতা এসে যায়। তাই দাম 4 টাকা থেকে কমে 2 টাকা হলেও চাহিদার পরিমাণ খুব একটা বাড়ে না— এক্ষেত্রে দাম 50% কমাতে চাহিদা মাত্র 10% বেড়েছে।

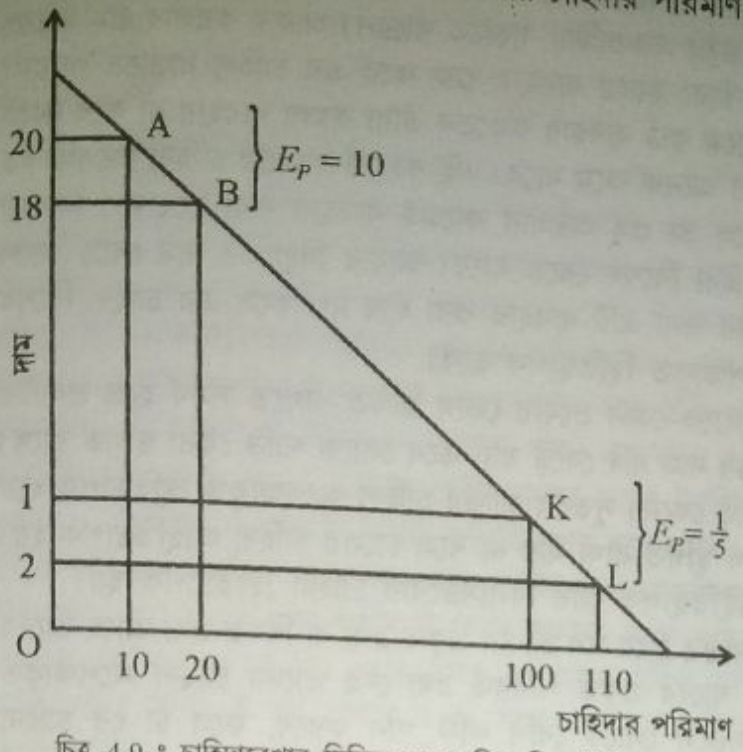

চিত্র 4.9 : চাহিদারেখার বিভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন স্থিতিস্থাপকতা

4.1.5. চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতা নির্ধারক বিষয়সমূহ [Factors Determining Price Elasticity of Demand]

কিছু কিছু দ্রব্যের ক্ষেত্রে দাম সামান্য কমলে চাহিদা ভীষণ বেড়ে যায় — যেমন, বাড়ি বা গয়না। আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে দাম অনেকটা কমলেও চাহিদা বিশেষ বাড়ে না—যেমন, নুন বা বিদ্যুৎ। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, দাম ভীষণভাবে বাড়লেও চাহিদা বিশেষ কমে না—যেমন জীবনদায়ী ওষুধ বা শিক্ষার জন্য ব্যয়। সুতরাং চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বিভিন্ন দ্রব্যের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন হয়। এটি কেন হয় তা বুঝতে হলে আমাদের জানতে হবে চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতা কি কি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতা নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর ওপর নির্ভর করে।

1. দ্রব্যের প্রকৃতি : যে সকল দ্রব্যের আবশ্যকতা বা প্রয়োজনীয়তা যত বেশি হবে সে সকল দ্রব্যের চাহিদা ততই অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক হবে। এই কারণে চাল, গম, তেল, লবণ, জামাকাপড় ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিমাণে বিশেষ পরিবর্তন হয় না। আবার, শৌখিন বা বিলাসদ্রব্যের আবশ্যকতা বা প্রয়োজনীয়তা যেহেতু বেশি নয়, তাই এই সকল দ্রব্যের চাহিদা অপেক্ষাকৃত স্থিতিস্থাপক হবে। এই কারণে ফ্রিজ, টি.ভি. সেট, ওয়াশিং মেশিন, এয়ার কন্ডিশনার মেশিন, শৌখিন আসবাবপত্র ইত্যাদি বিলাসদ্রব্যের চাহিদা অপেক্ষাকৃত স্থিতিস্থাপক হয়ে থাকে। এদের দামের সামান্য হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে চাহিদার পরিমাণের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়। অবশ্য ক্রেতার কাছে কোন্ দ্রব্যটি প্রয়োজনীয় এবং কোন্‌টি বিলাসদ্রব্য তা নির্ভর করে ক্রেতার আয়, রুচি, পছন্দ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার ওপর।

2. ব্যবহারের সংখ্যা ও বৈচিত্র্য : যে সকল দ্রব্য নানাভাবে ব্যবহৃত হতে পারে তাদের চাহিদা অপেক্ষাকৃত স্থিতিস্থাপক হয়। যেমন কয়লা, বিদ্যুৎ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। কয়লা রান্নার কাজ,

কলকারখানা, রেলইঞ্জিন ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। কয়লার দাম কমলে যাঁরা রান্নার কাজে কাঠ ব্যবহার করতেন তাঁরা কয়লা ব্যবহার শুরু করে এর চাহিদা বাড়াতে পারেন। আবার কয়লার দাম বাড়লে যাঁরা রান্নার কাজে কাঠ ব্যবহার করতেন তাঁরা কয়লা ব্যবহার শুরু করে এর চাহিদা বাড়াতে পারেন। আবার কয়লার দাম বাড়লে যাঁরা রান্নার কাজে কাঠ ব্যবহার করতেন তাঁরা কয়লা ব্যবহার না করে কাঠই ব্যবহার করবেন। এর ফলে কয়লার চাহিদা অনেক কমে যাবে। এই কারণে কয়লার চাহিদা অপেক্ষাকৃত স্থিতিস্থাপক হবে। বিদ্যুতের দাম কমে গেলে তা শুধু আলোর কাজেই ব্যবহার করা হবে না। অন্যান্য কাজেও ব্যবহার করা হবে। ফলে এর চাহিদা বিশেষ বেড়ে যাবে। আবার বিদ্যুতের দাম বেড়ে গেলে প্রয়োজনীয় কাজ ছাড়া অপ্রয়োজনীয় কাজের জন্য এটি ব্যবহার করা হবে না। ফলে এর চাহিদা বিশেষ কমে যাবে। কাজেই বিদ্যুতের চাহিদা অপেক্ষাকৃত স্থিতিস্থাপক হবে।

3. ভোগ স্থগিত রাখার সম্ভাবনা ঃ লোকে কোন দ্রব্যের ভোগ স্থগিত রাখতে সমর্থ হলে দ্রব্যটির চাহিদা স্থিতিস্থাপক হবে। যেমন মোটরগাড়ির দাম যদি বেড়ে যায় তবে লোকে গাড়ি কেনা স্থগিত রাখে। পরে আবার গাড়ির দাম কমলে লোকে গাড়ি কেনে। সুতরাং গাড়ির চাহিদা অপেক্ষাকৃত স্থিতিস্থাপক হয়ে থাকে। কিন্তু চালের দাম বেড়ে গেলে ভোগ স্থগিত রাখা যায় না বলে চালের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয়। এই কারণে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক আর বিলাসদ্রব্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয়।

27

4. পরিবর্ত দ্রব্যের বা বিকল্প দ্রব্যের অস্তিত্ব ঃ যে সব দ্রব্যের প্রকৃত দ্রব্য বা বিকল্প দ্রব্য আছে তাদের চাহিদা অপেক্ষাকৃত স্থিতিস্থাপক হয়, আর যাদের প্রকৃত পরিবর্ত দ্রব্য নেই তাদের চাহিদা অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক হয়। যেমন, চা-এর দাম বাড়লে লোকে বেশি কফি পান করবে, ফলে চা-এর চাহিদা বিশেষভাবে কমে যায়। সুতরাং চা-এর চাহিদা এক্ষেত্রে স্থিতিস্থাপক হবে। কিন্তু যে সকল দ্রব্যের পরিবর্ত বা বিকল্প দ্রব্য নেই তাদের চাহিদা অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক হয়। যেমন, সিগারেটের দাম বাড়লে লোকে ধূমপান ছেড়ে সাধারণত পান খাওয়া শুরু করে না। তাই সিগারেটের চাহিদা অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক হয়ে থাকে।

5. দ্রব্যের সংজ্ঞা ঃ আবার কোন দ্রব্যের প্রকৃত বিকল্প আছে কিনা তা নির্ভর করে দ্রব্যটির কিভাবে সংজ্ঞা দেওয়া হচ্ছে তার ওপর। ব্যাপক অর্থে জামা-কাপড়ের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক। কিন্তু রেমণ্ডসের বা বিমলের জামা-কাপড়ের চাহিদা স্থিতিস্থাপক। আবার, সিগারেটের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক। কিন্তু 555-এর চাহিদা স্থিতিস্থাপক। এর কারণ ব্যাপক অর্থে একটি দ্রব্যের পরিবর্ত দ্রব্য নাও থাকতে পারে কিন্তু সংকীর্ণ অর্থে এর অনেক পরিবর্ত আছে।

6. পরিপূরক দ্রব্যের দাম ঃ চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা পরিপূরক দ্রব্যের দামের ওপরও নির্ভর করে। কোন দ্রব্যের পরিপূরক দাম বাড়লে/কমলে ঐ দ্রব্যটির চাহিদা উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে/বাড়বে। যেমন, পেট্রলের দাম বাড়লে মোটরগাড়ির চাহিদা বিশেষভাবে কমে যাবে। আবার চিনি বা দুধের দাম কমলে চা-এর চাহিদা বিশেষভাবে বেড়ে যাবে।

7. অভ্যাস ও প্রথা বা রীতি ঃ ক্রেতার কোন দ্রব্যের চাহিদা তার অভ্যাসের ওপর নির্ভর করে। এমন কতকগুলো দ্রব্য আছে (যেমন সিগারেট, বিড়ি, পান ইত্যাদি) যাদের দাম বেড়ে গেলেও অথবা আয় কমে গেলেও অভ্যাসের তাগিদে ক্রেতা ঐ সমস্ত দ্রব্য কিনে থাকে। এজন্য এই সমস্ত দ্রব্যের দামগত (বা আয়গত) স্থিতিস্থাপকতার মান 1-এর কম হয় অর্থাৎ এই সমস্ত দ্রব্যের চাহিদা অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক হয়। আবার সামাজিক প্রথা বা রীতি অনুসারে আমাদের দেশে বিয়েতে সোনার গয়না দিতে হয়। সোনার দাম বেড়ে গেলেও আমাদের এই প্রথা মানতে হয়। কাজেই সোনার চাহিদা অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক হয়ে থাকে।

8. আয়ের স্তর ঃ উচ্চ-আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বেলায় দামের হ্রাস-বৃদ্ধিতে চাহিদার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় না। কিন্তু দামের হ্রাস-বৃদ্ধিতে কম আয়বিশিষ্ট লোকেদের চাহিদার পরিবর্তন ঘটে — যেমন, মাছের দাম বাড়লেও ধনী ব্যক্তিরা আগের মতো মাছ কিনে থাকেন, কিন্তু গরীব লোকেরা মাছ কেনার পরিমাণ কমিয়ে দেন। তাই উচ্চ-আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে মাছের চাহিদা অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক কিন্তু কম আয়বিশিষ্ট গরীব লোকেদের কাছে মাছের চাহিদা অপেক্ষাকৃত স্থিতিস্থাপক।

9. সময় মেয়াদ ঃ সময় যত দীর্ঘ হয় চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা তত বেশি হয়। স্বল্পকালীন সময়ে কোন দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয়। যেমন, সরষের তেলের মতো প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বাড়লে স্বল্পকালে এর চাহিদা বিশেষ কমে না। তাই স্বল্পকালে সরষের তেলের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয়। কিন্তু বহুদিন ধরে

এই বর্ধিত দাম বজায় থাকলে সরষের তেলের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বেড়ে যাবে। কারণ সরষের তেল ব্যবহারকারীরা তার বিকল্প দ্রব্যের (যেমন, বাদাম তেল, সানফ্লাওয়ার তেল, স্যাফোলা তেল, সয়াবীনের তেল, রেপসীড তেল) দিকে ঝুঁকবে। এর ফলে সরষের তেলের চাহিদা আরো বেশি স্থিতিস্থাপক হয়ে পড়বে।

10. দ্রব্যের স্থায়িত্ব ঃ স্থায়ী দ্রব্যের চাহিদা অপেক্ষাকৃত স্থিতিস্থাপক হয়ে থাকে। আবার লোকে যদি নেশাগ্রস্ত হয়ে কোন দ্রব্য ভোগ করে অথবা যদি প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা থাকে চাহিদা স্বল্পকালে অস্থিতিস্থাপক এবং দীর্ঘকালে স্থিতিস্থাপক হয়। যেমন, বাজেটে সিগারেটের দাম বাড়া সত্ত্বেও ধূমপায়ীরা সিগারেট খাওয়া রাতারাতি কমাতে পারেন না। তবে সিগারেটের দাম যদি ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে তাহলে দীর্ঘকালে অধিকাংশ লোকে ধূমপান কমিয়ে এবং বেশ কিছু লোক ছেড়ে দেবেন বলে মনে হয়। তবে এর একটি বিপরীত উদাহরণও দেওয়া যায়। প্রায় প্রতি বছরই আমাদের দেশে পেট্রল ও ডিজেলের দাম বাড়ে। ফলে বাস ও ট্যাক্সি ভাড়া বেড়ে যায়। এর ফলে হঠাৎ লোকে ট্যাক্সি চড়া কমিয়ে দেন। কিন্তু কিছুদিন পর থেকে আবার লোকে সেই আগের মতো ট্যাক্সি চড়া শুরু করেন। তাই এক্ষেত্রে চাহিদা স্বল্পকালে স্থিতিস্থাপক আর দীর্ঘকালে অস্থিতিস্থাপক হয়ে থাকে। আবার আমরা দেখি যে, পাহাড়ী সমতলে গরীব লোকেরাও দামী জামা-কাপড় পরে। এটির জন্য প্রাকৃতিক কারণ দায়ী। তাই কোট বা উলের জামার দাম বেড়ে গেলেও একজন গরীব লোককে সামান্য খরচ কমিয়ে শীতের হাত থেকে বাঁচার জন্য গরম পোশাক-পরিচ্ছদ পরতে হবে। তাই এসব পোশাকের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয়। কারণ ঐ সব দ্রব্যের দাম বেড়ে গেলে ক্রেতা ঐ সব দ্রব্যের ওপর ব্যয়ের পরিমাণ কমিয়ে দেয়। আবার, ঐ সব দ্রব্যের দাম কমে গেলে ক্রেতার ঐ সব দ্রব্যের ওপর ব্যয়ের পরিমাণ বেড়ে যায়। যেমন, আসবাবপত্র, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেসিন, তারবিহীন ফোন ইত্যাদি। কিন্তু অস্থায়ী দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয়। এই সব দ্রব্য দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার করা যায় না বলেও কিছুটা প্রয়োজনীয় বলেই এদের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয়।

11. দামের স্তর ঃ কোন দ্রব্যের দাম যখন খুব বেশি হয়, তখন তার চাহিদা অপেক্ষাকৃত স্থিতিস্থাপক হয়ে থাকে। কারণ দাম আরো বেড়ে গেলে দ্রব্যটির চাহিদা বিশেষ কমে যায়। আবার কোন দ্রব্যের দাম যখন খুব কম হয়, তখন তার চাহিদা অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক হয়ে থাকে। কারণ দাম এত কম যে, দাম আরো কমলে দ্রব্যটির চাহিদা বিশেষ বাড়ে না। তাই দামের উচ্চ স্তরে যে কোন দ্রব্যের চাহিদা অপেক্ষাকৃত স্থিতিস্থাপক এবং দামের নিম্নস্তরে ঐ একই দ্রব্যের চাহিদা অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক হয়ে থাকে। [4.10 নং চিত্রে বিষয়টি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।]

12. দ্রব্যটির ওপর আয়ের কত অংশ ব্যয় হয় ঃ পরিশেষে কোন দ্রব্যের আয়ের কত অংশ ব্যয় করা হয় তার ওপরও চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা অনেকটা নির্ভর করে। কোন দ্রব্যের জন্য আয়ের একটি বড় অংশ ব্যয় করা হলে দ্রব্যটির চাহিদা অপেক্ষাকৃত স্থিতিস্থাপক হয়। কারণ এ ক্ষেত্রে দ্রব্যটির দাম বেড়ে গেলে চাহিদা বিশেষভাবে কমে যায়। আবার কোন দ্রব্যের জন্য আয়ের খুব সামান্য অংশ ব্যয় করা হলে দ্রব্যটির চাহিদা অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক হয়। যেমন, ধনী লোকেরা মোটরগাড়ি কেনার জন্য তাদের আয়ের খুব সামান্য অংশ ব্যয় করে বলে তাদের কাছে মোটরগাড়ির চাহিদা অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক হয়। আবার, গাড়ির চাহিদার চেয়ে টায়ারের চাহিদা বা কলমের চেয়ে কালির চাহিদা বা জুতোর চেয়ে মোজার চাহিদা বেশি অস্থিতিস্থাপক হয়। একটা গাড়ির দাম মাত্র 10% বাড়লে (5,00,000 টাকা থেকে 5,50,000 হলে) চাহিদা যত কমবে একটি গাড়ির টায়ারের দাম 20% বাড়লেও (2,000 টাকা থেকে 2,400 টাকা) চাহিদা ততটা কমবে না।

4.1.6. চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার গুরুত্ব [Importance of the Elasticity of Demand]

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার ধারণা তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক উভয় দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। স্থিতিস্থাপকতা সম্পর্কে ধারণা থাকলে বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি বোঝা যায়। এই প্রসঙ্গে নিচের বিষয়গুলো উল্লেখ করা যায় ঃ

1. উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের দ্রব্যের দাম নির্ধারণে ঃ কোন উৎপাদকের ভারসাম্যের অবস্থা জানতে গেলে বা সে উৎপাদিত দ্রব্য বাজারে কতটা পরিমাণ বিক্রি করবে ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হলে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার ধারণা থাকা প্রয়োজন। উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদা যদি স্থিতিস্থাপক হয়, তাহলে দ্রব্যের দাম বাড়িয়ে দিলে উৎপাদকের মোট আয় হ্রাস পেতে পারে এবং অপরদিকে, চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হলে দাম বাড়লেও মোট আয় হ্রাস পায় না। আর কোন দ্রব্যের চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতার মান যদি 1 হয়,

তাহলে দাম বাড়লে বা কমলে বিক্রেতার মোট আয় বা রেভিনিউ-এর কোন পরিবর্তন হবে না। সুতরাং এক্ষেত্রে দাম বাড়িয়ে বা কমিয়ে ফার্মের কিছু লাভ হবে না। সুতরাং দাম স্থির রাখাই ভাল। সুতরাং, দাম নির্ধারণ ও মুনাফার হিসাব করতে হলে ফার্মের পরিচালকদের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার ধারণা থাকা প্রয়োজন।

ধরা যাক, কোলকাতার কোন ফুটবল ক্লাব সল্ট লেক স্টেডিয়ামে একটি বড় ধরনের ম্যাচের আয়োজন করেছে। ক্লাবটির উদ্দেশ্য হল বিদেশ থেকে নামী খেলোয়াড়দের নিয়ে এসে সবচেয়ে বেশি মুনাফা অর্জন করা। দর্শকদের সংখ্যা কম বা বেশি যাই হোক না কেন, ক্লাবের খরচ একই হবে। ফুটবল ম্যাচ দেখার জন্য দর্শকদের চাহিদা তালিকাটি হল নিম্নরূপ ঃ

টিকিটের দাম (টাকা)	এই দামে দর্শকদের সংখ্যা	দর্শকদের মোট ব্যয় (টাকা)
10	60000	600000
20	56000	1120000
30	50000	1500000
40	32000	1280000

এক্ষেত্রে ক্লাবটি টিকিটের দাম যদি 30 টাকা ধার্য করে তাহলে 50,000 দর্শক এই ম্যাচটি দেখবেন। ফলে ক্লাবের মোট বিক্রয়লব্ধ আয় (রেভিনিউ) সর্বাধিক হবে। মোট ব্যয় স্থির থাকায় রেভিনিউ সর্বাধিক করার অর্থ হল মোট মুনাফা সর্বাধিক করা।

অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে বা একচেটিয়া বাজারে উৎপাদককে দাম নির্ধারণের ব্যাপারে স্থিতিস্থাপকতা সম্বন্ধে সজাগ থাকতে হয়। একচেটিয়া কারবারী আবার বিভিন্ন ক্রেতার বিভিন্ন চাহিদার ভিত্তিতে একই দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন দাম ধার্য করে। এই ধরনের ব্যবস্থাকে **দাম পৃথক করা** বা **দাম পৃথকীকরণ** বলে। [এ সম্পর্কে 9 নং অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে।]

2. শ্রমিকের মজুরি নির্ধারণ ঃ মালিক সংঘের সঙ্গে শ্রমিক সংঘের যৌথ দর কষাকষির (collective bargaining) বেলায় স্থিতিস্থাপকতার ধারণা প্রয়োগ করা হয়। শ্রমিক সংঘ কেবল তখনই মজুরি বাড়াতে সক্ষম হয় যখন শ্রমের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয়। এই কারণে পাইলটরা ধর্মঘটের মাধ্যমে প্রায়ই তাঁদের বেতন বাড়িয়ে থাকেন কারণ এঁদের কাজ অন্য লোক দিয়ে হয় না। এই অবস্থায় মালিকের পক্ষে শ্রমিকের পরিবর্তে অন্য উপাদান ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। কিন্তু শ্রমের চাহিদা স্থিতিস্থাপক হলে শ্রমিক সংঘ মজুরি বৃদ্ধিতে বিশেষ সফল হয় না। যদি তারা মজুরি বাড়াতে সক্ষম হয়, তাহলে মালিক শ্রমের পরিবর্তে অন্য উপাদানের ব্যবহার শুরু করবে।

ধরা যাক, ভারতের মোটরগাড়ি শিল্পের শ্রমিকরা মজুরি বৃদ্ধির দাবি জানালেন। এই দাবি মেনে নেওয়া হল। এর ফলে নিয়োগ সংখ্যা কমবে না বাড়বে তা নির্ভর করে মোটরগাড়ির চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার ওপর। 4.10 নং চিত্রে বিষয়টি বোঝানো হয়েছে। মজুরি বাড়লে মোটরগাড়ি তৈরি করার ব্যয় বাড়বে। ফলে এই একই দামে কম সংখ্যক গাড়ি যোগান দেওয়া হবে। অর্থাৎ মোটরগাড়ির যোগানরেখা বাঁদিকে (S_1 থেকে S_2) সরে যাবে। গাড়ির উৎপাদন কমবে — কিন্তু কতটা কমবে তা নির্ভর করে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার ওপর। চাহিদা স্থিতিস্থাপক হলে উৎপাদন OQ_3 থেকে কমে হবে OQ_1; আর চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হলে উৎপাদনের পরিমাণ OQ_3 থেকে কমে OQ_1 হবে। চাহিদা ও যোগান অনুসারে যে ক্ষেত্রে চাহিদা স্থিতিস্থাপক, সেক্ষেত্রে যোগানের পরিবর্তন ঘটলে বিক্রির পরিমাণ

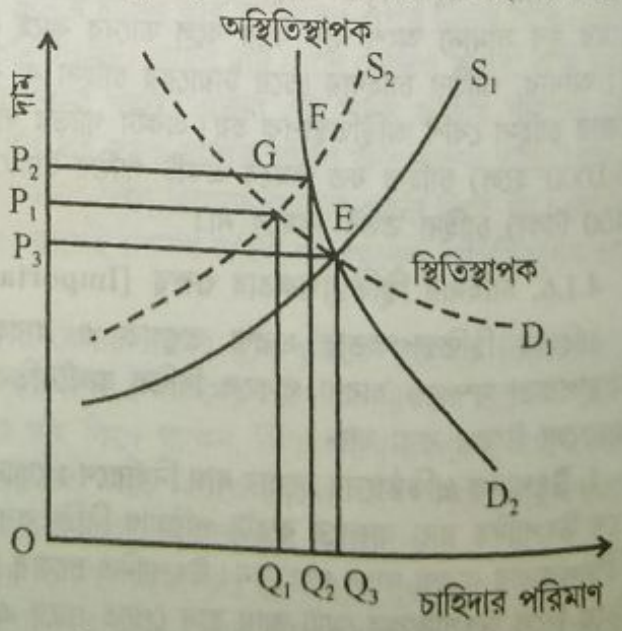

চিত্র 4.10 ঃ মোটরগাড়ির চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা

কমবে বা বাড়বে। পক্ষান্তরে চাহিদা যদি অস্থিতিস্থাপক হয় তাহলে বিক্রির পরিমাণ মোটামুটি স্থির থাকবে কিন্তু দামের পরিবর্তন ঘটবে। সুতরাং যদি মোটরগাড়ির চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয় তাহলে মোটরগাড়ি শিল্পে মজুরি বাড়লে অনেক শ্রমিক বেকার হয়ে যাবেন। তাই শ্রমিক সংঘ কোন শিল্পে মজুরি বাড়াতে পারবে কিনা তা নির্ভর করে ঐ শিল্পে যে দ্রব্যটি উৎপাদিত হয় তার চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার ওপর।

3. সরকারি অর্থনৈতিক নীতি ও কর্মপন্থা নির্ধারণে ঃ বিভিন্ন দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার ভিত্তিতে সরকার বিভিন্ন দ্রব্যের ওপর কর (পরোক্ষ কর) ধার্য করে। পরোক্ষ কর ধার্য করার অন্যতম উদ্দেশ্য হল সরকারি আয়ের বৃদ্ধি ঘটানো। সরকার সেই সমস্ত দ্রব্যের ওপরই কর স্থাপন করেন যাদের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক। এই সমস্ত দ্রব্যের ক্ষেত্রে (কর বসানোর জন্য) দাম বেড়ে গেলেও চাহিদা বিশেষ কমে না। ফলে সরকারি আয়ের বা রাজস্বের বৃদ্ধি ঘটে। অপরদিকে, স্থিতিস্থাপক চাহিদা আছে এ ধরনের দ্রব্যের ওপর উচ্চ হারে কর বসালে সরকারি রাজস্বের বিশেষ বৃদ্ধি না ঘটে বরং হ্রাস ঘটে। এই সমস্ত দ্রব্যের দাম বেড়ে গেলে চাহিদা অনেকটা কমে যায়।

ধরা যাক, একটি দ্রব্যের চাহিদা তালিকাটি হল নিম্নরূপ ঃ

দাম (টাকা)	চাহিদার পরিমাণ ('000)
4	200
3	600
2	1000

ধরা যাক, দ্রব্যটির উৎপাদন ব্যয় উৎপন্নের সকল স্তরে স্থির থাকে এবং এটির বাজার দাম হল 2 টাকা। এই দামে দ্রব্যটির চাহিদা হল এক মিলিয়ন একক। এখন অর্থমন্ত্রী সিদ্ধান্ত নিলেন যে, দ্রব্যটির ওপর 1 টাকা করে ইউনিট প্রতি কর বসানো হবে। ফলে দ্রব্যটির দাম 2 টাকা থেকে বেড়ে 3 টাকা হবে। ফলে দ্রব্যটির চাহিদা কমে হবে 6,00,000 ইউনিট এবং সরকারের রেভিনিউ (কর রাজস্ব) হবে 6 লক্ষ টাকা। কিছুদিন পর অন্তর্বর্তী বাজেটে (interim budget) যদি ইউনিট প্রতি আবার 1 টাকা কর বসানো হয় তাহলে দ্রব্যটির দাম 3 টাকা থেকে বেড়ে 4 টাকা হবে। এই দুটি দামের মধ্যে চাহিদা হল ভীষণভাবে স্থিতিস্থাপক। তাই দাম বেড়ে 4 টাকা হলে দ্রব্যটির চাহিদা হবে মাত্র 2 লক্ষ ইউনিট। মাত্র 2 লক্ষ ইউনিট বিক্রি হওয়ায় সরকারের রাজস্ব কম হবে— 4 লক্ষ টাকা। তাই যদি সরকারের উদ্দেশ্য হয় কোন দ্রব্যের ওপর কর বসিয়ে রাজস্ব বাড়ানো তাহলে সরকারকে এমন সমস্ত দ্রব্য নির্বাচন করতে হবে যাদের চাহিদা হল অস্থিতিস্থাপক। এই কারণে প্রতিটি বাজেটে সিগারেট, পেট্রল ইত্যাদির ওপর পরোক্ষ কর বসানো হয়।

4. করপাত নির্ধারণে ঃ আবার, করপাত (incidence of tax) নির্ধারণেও চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার ধারণাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যে সমস্ত দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক সেই সমস্ত দ্রব্যের ক্ষেত্রে উৎপাদক করের বোঝা ক্রেতার ওপর সহজেই চাপিয়ে দিতে পারে। কিন্তু, স্থিতিস্থাপক চাহিদা আছে এ রকম দ্রব্যের ক্ষেত্রে করের ভার চাপানো কঠিন। অনুরূপভাবে, আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যের ওপর শুল্ক ধার্যের ব্যাপারেও চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা জানা আবশ্যক।

5 বিনিময় হার নির্ধারণে ঃ বিনিময় হার (the rate of foreign exchange) নির্ধারণে স্থিতিস্থাপকতার ধারণাটির সাহায্য নেওয়া হয়। এক দেশের মুদ্রাকে অপর দেশের মুদ্রায় প্রকাশ করাকে বিনিময় হার বলে। (যেমন, ভারত ও আমেরিকার মুদ্রা বিনিময়ের হার হল 1 ডলার = 48 টাকা।) এই বিনিময় হার নির্ধারণে ও সর্বোপরি বিনিময় হার কমানো (devaluation) ও বাড়ানোর (revaluation) ক্ষেত্রে সরকার আমদানি ও রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার ধারণাটি প্রয়োগ করে থাকেন।

6. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের শর্তাবলী নির্ধারণে ঃ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে যে বাণিজ্যের হার (যে হারে আমদানির সঙ্গে রপ্তানির বিনিময় হয়) তাকে বাণিজ্য হার বলে। এটি দেশের পারস্পরিক চাহিদার [reciprocal demand] স্থিতিস্থাপকতার দ্বারা নির্ধারিত হয়। বিশ্বব্যাপী তেলের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হওয়ায় তেল রপ্তানিকারী দেশগুলো অতীতে বহুবারই তেলের দাম বাড়িয়ে লাভবান হয়েছে।

4.2. চাহিদার আয়গত স্থিতিস্থাপকতা [Income Elasticity of Demand]

কোন দ্রব্যের চাহিদা শুধু তার দামের ওপরই নির্ভর করে না, ক্রেতাদের আয়ের ওপরই নির্ভর করে।

আয়ের পরিবর্তন ও চাহিদার পরিবর্তন সাধারণত একদিকে হয়। আয় বাড়লে চাহিদা বাড়ে এবং আয় কমলে চাহিদা কমে। ক্রেতার আয়ের পরিবর্তনের ফলে দ্রব্যের চাহিদার যে পরিবর্তন হয় তাকে চাহিদার আয়গত স্থিতিস্থাপকতা বলে। এর সূত্র হল ঃ

$$\text{চাহিদার আয়গত স্থিতিস্থাপকতা } (e_y) = \frac{\text{চাহিদার শতকরা পরিবর্তন}}{\text{আয়ের শতকরা পরিবর্তন}}$$

$$= \frac{\dfrac{\text{চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন}}{\text{পুরোনো চাহিদার পরিমাণ}} \times 100}{\dfrac{\text{আয়ের পরিবর্তন}}{\text{পুরোনো আয়}} \times 100}$$

অথবা, সাংকেতিক ভাষায় ঃ

$$e_y = \frac{\dfrac{\Delta Q}{Q} \times 100}{\dfrac{\Delta Y}{Y} \times 100} = \frac{\dfrac{\Delta Q}{Q}}{\dfrac{\Delta Y}{Y}} = \frac{\Delta Q}{Q} \times \frac{Y}{\Delta Y} = \frac{\Delta Q}{\Delta Y} \cdot \frac{Y}{Q}.$$

এখানে Q = পুরোনো চাহিদার পরিমাণ,
Y = পুরোনো আয়,
ΔQ = চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন এবং
ΔY = আয়ের পরিবর্তন।

চাহিদার আয়গত স্থিতিস্থাপকতার সংজ্ঞা থেকে বোঝা যায় যে, ক্রেতার আয় বাড়লে/কমলে যদি চাহিদা বাড়ে/কমে তাহলে চাহিদা ও আয়ের পরিবর্তন ধনাত্মক হয় এবং e_y ধনাত্মক হয়। এর অর্থ হল এই যে, ক্রেতার আয় ও চাহিদা যদি একই দিকে পরিবর্তিত হয় তাহলে আয়গত স্থিতিস্থাপকতা ধনাত্মক হয়। সাধারণত স্বাভাবিক দ্রব্যের ক্ষেত্রে এরকম ঘটে থাকে। পক্ষান্তরে ক্রেতার আয় ও চাহিদা যদি বিপরীত দিকে পরিবর্তিত হয় অর্থাৎ ক্রেতার আয় বাড়লে/কমলে যদি চাহিদা কমে/বাড়ে তাহলে চাহিদার আয়গত স্থিতিস্থাপকতা e_y ঋণাত্মক হয়।

4.11 নং চিত্রে আয়গত স্থিতিস্থাপকতার ভিত্তিতে তিন ধরনের দ্রব্যের মধ্যে পার্থক্য দেখানো হয়েছে। এই তিনটি রেখাকে বলে **আয়গত চাহিদারেখা [income demand curve] বা এঙ্গেল রেখা [Engel**

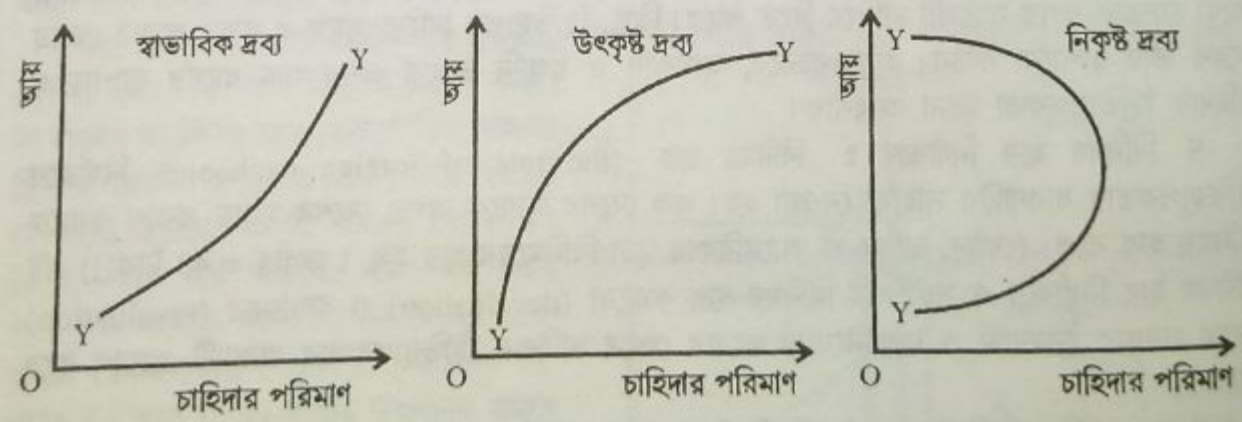

চিত্র 4.11 ঃ তিন ধরনের দ্রব্যের শ্রেণীবিভাগ

Curve]। এই রেখাগুলো ক্রেতার (ক্রেতাদের) আয়ের সঙ্গে দ্রব্যাদির চাহিদার সম্পর্ক দেখায়। স্বাভাবিক দ্রব্যের ক্ষেত্রে e_y-এর মান শূন্যের চেয়ে বেশি কিন্তু 1-এর চেয়ে কম, উৎকৃষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রে 1-এর বেশি হয়। আর নিকৃষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রে শূন্যের চেয়ে কম (অর্থাৎ ধনাত্মক) হয়। সাধারণত নিকৃষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রে এরকম ঘটে থাকে।

ধারণাটির ব্যবহারিক প্রয়োগ ঃ ভোগ্যদ্রব্যের শ্রেণীবিভাগের জন্য চাহিদার আয়গত স্থিতিস্থাপকতার

ধারণা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আমরা সাধারণত দু'ধরনের দ্রব্য দেখতে পাই : প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও বিলাস দ্রব্য। প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদার আয়গত স্থিতিস্থাপকতার মান 1-এর কম হয়—অর্থাৎ আয়ের দিক থেকে চাহিদা অস্থিতিস্থাপক। অপরদিকে বিলাস দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদার আয়গত স্থিতিস্থাপকতার মান 1-এর বেশি হয়— অর্থাৎ আয়ের দিক থেকে চাহিদা স্থিতিস্থাপক। সুতরাং স্বাভাবিক দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদার আয়গত স্থিতিস্থাপকতা ধনাত্মক হয় এবং বিলাস দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদার আয়গত স্থিতিস্থাপকতা বেশি হয়ে থাকে। চাহিদার আয়গত স্থিতিস্থাপকতা বেশি এমন কয়েকটি দ্রব্য হল : রঙিন টি.ভি. সেট, দামী মোটরগাড়ি এবং দামী অলংকার।

নিকৃষ্ট দ্রব্য [Inferior goods] : আর কোন দ্রব্য নিকৃষ্ট হলে এটির আয়গত স্থিতিস্থাপকতা ধনাত্মক হয়। এক্ষেত্রে আয় বাড়লে চাহিদা কমে—যেমন পুরানো গাড়ি, কমদামী জামা, নিকৃষ্ট ধরনের খাদ্য (যেমন ছাতু)।

আয়-নিরপেক্ষ দ্রব্য [Income-neutral goods] : কিছু কিছু দ্রব্য আছে আয়ের পরিবর্তনে যাদের চাহিদার কোন পরিবর্তন হয় না। যেমন, পাঠ্যপুস্তক, লেখার কলম বা জীবনদায়ী ওষুধ। এদের আয়-নিরপেক্ষ দ্রব্য বলে। এদের ক্ষেত্রে আয়গত চাহিদা রেখা উল্লম্ব সরলরেখা হবে।

4.3. চাহিদার পারস্পরিক (ক্রম) স্থিতিস্থাপকতা [Cross-Elasticity of Demand]

কোন দ্রব্যের চাহিদা শুধু ঐ দ্রব্যের দামের ওপরই নির্ভর করে না, তার সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের —অর্থাৎ পরিবর্ত দ্রব্য এবং পরিপূরক দ্রব্যের —দামের ওপরও নির্ভর করে। ক্রেতার আয়, রুচি ও পছন্দ স্থির থাকলেও কোন একটি দ্রব্যের দামের নির্দিষ্ট হারে পরিবর্তনের ফলে অন্য কোন দ্রব্যের চাহিদার যে পরিবর্তন ঘটে, সেই পরিবর্তনের হারকে চাহিদার পারস্পরিক দামগত স্থিতিস্থাপকতা বলে। চাহিদার পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতার সূত্রটি হল নিম্নরূপ :

$$\text{চাহিদার পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা } (e_c) = \frac{X \text{ দ্রব্যের চাহিদার শতকরা পরিবর্তন}}{Y \text{ দ্রব্যের দামের শতকরা পরিবর্তন}}$$

$$= \frac{\dfrac{X \text{ দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তন}}{X \text{ দ্রব্যের পুরোনো চাহিদা}} \times 100}{\dfrac{X \text{ দ্রব্যের দামের পরিবর্তন}}{Y \text{ দ্রব্যের পুরোনো চাহিদা}} \times 100}$$

$$= \frac{\dfrac{\Delta Q_x}{Q_y} \times 100}{\dfrac{\Delta P_x}{P_y} \times 100} = \frac{\dfrac{\Delta Q_x}{Q_x}}{\dfrac{\Delta P_y}{P_y}}$$

$$= \frac{\Delta Q}{Q_x} \times \frac{P_y}{\Delta P_y} = \frac{\Delta Q_x}{\Delta P_y} \cdot \frac{P_y}{Q_x}.$$

এখানে P_y = Y দ্রব্যের পুরোনো দাম,
ΔP_y = Y দ্রব্যের দামের পরিবর্তন,
Q_x = X দ্রব্যের পুরোনো চাহিদা এবং
ΔQ_x = X দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তন।

চাহিদার পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা e_x ধনাত্মক হবে না ঋণাত্মক হবে তা নির্ভর করবে $\frac{\Delta Q_x}{\Delta P_y}$-এর ওপর কারণ P_y, Q_x সব সময়ই ধনাত্মক (>0)। $\frac{\Delta Q_x}{\Delta P_y}$ যদি ধনাত্মক (>0) হয় তাহলে e_x ধনাত্মক হবে এবং $\frac{\Delta Q_x}{\Delta P_y}$ যদি ঋণাত্মক (<0) হয় তাহলে e_c ঋণাত্মক হবে। X ও Y দ্রব্য দুটি যদি পরিপূরক হয় (যেমন,

মোটরগাড়ি ও পেট্রল) তাহলে Y-এর দাম হ্রাস/বৃদ্ধি পেলে X-এর চাহিদা বৃদ্ধি/হ্রাস পাবে। অর্থাৎ $\Delta P_y < 0$ হলে $\Delta Q_x > 0$ হবে এবং $\Delta P_y > 0$ হলে $\Delta Q_x < 0$ হবে। এর ফলে $\frac{\Delta Q_x}{\Delta P_y}$ ঋণাত্মক হবে। তাই e_c ঋণাত্মক হবে।

এককথায়, পরিপূরক দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদার পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা ঋণাত্মক হয়ে থাকে। পরিবর্ত দ্রব্যের ক্ষেত্রে এটি ধনাত্মক হয় এবং দুটি সম্পর্কবিহীন দ্রব্যের ক্ষেত্রে এটি শূন্য হয়।

চিত্রের সাহায্যে দ্রব্যের পারস্পরিক চাহিদা দেখানো যেতে পারে। 4.12 নং চিত্রের তিনটি অংশে তিনটি বিষয় দেখানো হয়েছে। এই চিত্রগুলো ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। এগুলি সহজেই বোঝা যায়। [ছাত্র-ছাত্রীদের একটু চিন্তা করতে বলা হচ্ছে।]

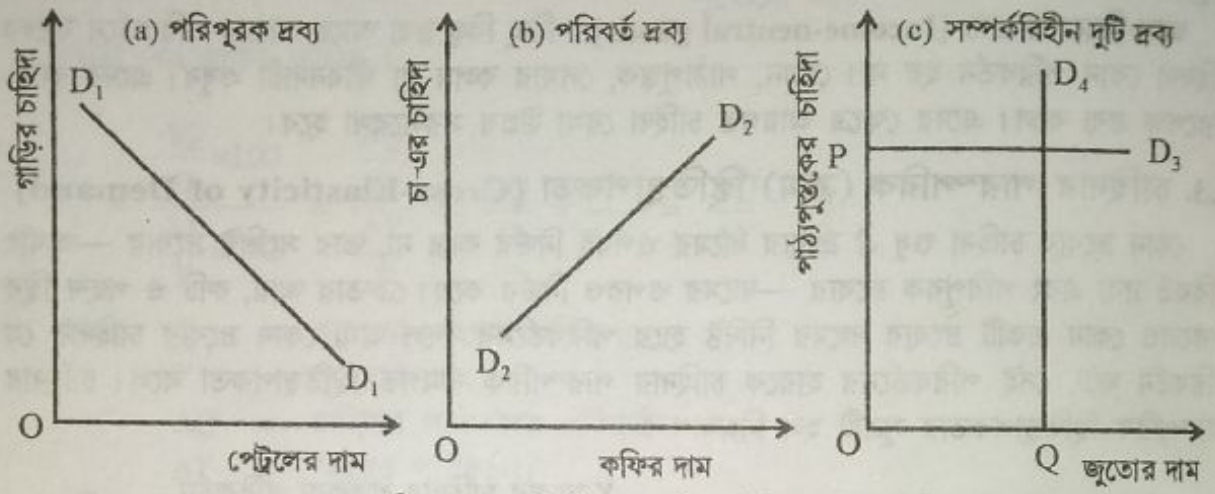

চিত্র 4.12 : তিনটি পারস্পরিক চাহিদারেখা

অর্থনৈতিক তাৎপর্য : চাহিদার ক্রম স্থিতিস্থাপকতারও অর্থনৈতিক তাৎপর্য আছে। কোন একটি দ্রব্যের দামের শতকরা পরিবর্তনের তুলনায় সংশ্লিষ্ট দ্রব্যটির চাহিদার শতকরা পরিবর্তন যদি অধিক হয় তাহলে চাহিদার পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা খুব বেশি হয়। যদি দুটি দ্রব্যের মধ্যে ক্রমস্থিতিস্থাপকতার মান উচ্চ হয়, তাহলে দ্রব্য দুটি একই শিল্পের অন্তর্গত বলে ধরতে হবে। যেমন পেপসি ও কোকা কোলা। এ দুটির দ্রব্যের যে কোন একটির দাম বাড়লে অপরটির চাহিদা অনেকটা বাড়বে। আর যদি দুটি দ্রব্যের মধ্যে ক্রমস্থিতিস্থাপকতার মান নিম্ন হয়, তাহলে দ্রব্য দুটি ভিন্ন ভিন্ন শিল্পের অন্তর্গত বলে অনুমান করতে হবে—যেমন জুতো আর পাঠ্যপুস্তক। এক্ষেত্রে একটি দ্রব্যের দামের পরিবর্তনে অপরটির চাহিদার পরিমাণ মোটেই বাড়বে বা কমবে না।

4.4. যোগানের স্থিতিস্থাপকতা [Elasticity of Supply]

দাম ও যোগানের পরিমাণের মধ্যে সম্পর্ক প্রত্যক্ষ। অর্থাৎ দাম কমলে যোগানের পরিমাণ কমে ও দাম বাড়লে যোগানের পরিমাণ বাড়ে। কিন্তু দামের কতখানি পরিবর্তনে যোগানের পরিমাণের কতখানি পরিবর্তন হয় তা যোগানের নিয়মের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না। দামের পরিবর্তনের ফলে যোগানের কতখানি পরিবর্তন হয় তা যোগানের স্থিতিস্থাপকতা থেকে জানা যায়। দ্রব্যের নিজের দামের পরিবর্তনে দ্রব্যটির যোগানের পরিমাণের পরিবর্তনের মাত্রাকে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা বলে। অথবা দামের 1 শতাংশ পরিবর্তনের ফলে যোগানের যে পরিবর্তন হয় সেটাই যোগানের স্থিতিস্থাপকতা। চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার মতো দামের শতাংশের পরিবর্তনের তুলনায় যোগানের শতাংশের পরিবর্তনকে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা বলে। অর্থাৎ,

$$\text{যোগানের স্থিতিস্থাপকতা} = \frac{\text{যোগানের আনুপাতিক পরিবর্তন}}{\text{দামের আনুপাতিক পরিবর্তন}}$$

$$= \frac{\dfrac{\text{যোগানের পরিমাণের পরিবর্তন}}{\text{মূল যোগানের পরিবর্তন}}}{\dfrac{\text{দামের পরিবর্তন}}{\text{মূল দাম}}}.$$

সাংকেতিক চিহ্ন দিয়ে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা প্রকাশ করা যায় ঃ

$$E_S = \frac{\Delta Q}{Q} + \frac{\Delta P}{P} = \frac{\Delta Q}{Q} \times \frac{P}{\Delta P} = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \times \frac{P}{Q}$$

E_s = যোগানের স্থিতিস্থাপকতা,
P = মূল দাম,
ΔP = দামের পরিবর্তন,
Q = মূল যোগানের পরিমাণ
এবং ΔQ = যোগানের পরিমাণের পরিবর্তন।

34

যোগান রেখার ঢাল ও স্থিতিস্থাপকতার মধ্যে সম্পর্ক ঃ

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার মতো যোগানের স্থিতিস্থাপকতাও যোগান রেখার ঢালের সঙ্গে সম্পর্কিত। যোগান রেখার ঢাল $\Delta P/\Delta Q$। একে মূল দাম ও মূল যোগানের পরিমাণের অনুপাত দিয়ে গুণ করে যোগানের স্থিতিস্থাপকতার মান নির্ধারণ করা হয়। সুতরাং, যোগানের স্থিতিস্থাপকতা

$$= \frac{1}{\text{যোগান রেখার ঢাল}} \times \frac{P}{Q} = \frac{1}{\frac{\Delta P}{\Delta Q}} \cdot \frac{P}{Q}$$

$$= \frac{\Delta P}{\Delta Q} \cdot \frac{P}{Q}.$$

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার মতো যোগানের স্থিতিস্থাপকতাও পাঁচ প্রকারের ঃ

$E_s \to \infty$ অর্থাৎ, সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক যোগান,
$E_s > 1 \to$ স্থিতিস্থাপক যোগান,
$E_s = 1 \to$ একক স্থিতিস্থাপক যোগান,
$E_s < 1 \to$ অস্থিতিস্থাপক যোগান,
$E_s = 0 \to$ সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক যোগান।

এই প্রসংগে মনে রাখতে হবে যে, চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার সহগের মান যেমন ঋণাত্মক হয় যোগানের স্থিতিস্থাপকতার মান সব সময়েই ধনাত্মক হয়। কারণ, দাম ও যোগানের মধ্যে সম্পর্ক প্রত্যক্ষ।

দামের 1 শতাংশ পরিবর্তনের জন্য যদি যোগানের পরিমাণে এর বেশি পরিবর্তন ঘটে তবে যোগান স্থিতিস্থাপক ($E_s > 1$)। অপরদিকে দামের 1 শতাংশের পরিবর্তনের ফলে যদি যোগানের পরিমাণের পরিবর্তন এর কম হয় তবে যোগান অস্থিতিস্থাপক ($E_s < 1$)। দাম পরিবর্তনের হার ও যোগানের পরিমাণের পরিবর্তনের হার সমান হলে তাকে সমহার বা একক স্থিতিস্থাপক যোগান ($E_s = 1$) বলে। দাম যাই হোক না কেন [এমনকি শূন্য হলেও] যোগান যদি অপরিবর্তিত থাকে তবে যোগানের স্থিতিস্থাপকতার মান শূন্য ($E_s = 0$)। এক্ষেত্রে যোগান রেখা উল্লম্ব অক্ষের সমান্তরাল। অপরদিকে, একটি নির্দিষ্ট দামে দ্রব্যের যোগান অসীম হলে যোগান সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক ($E_s \to \infty$)। ঐ দামের কমে দ্রব্যের যোগানের পরিমাণ যেমন শূন্য হয় আবার বেশি দামে যোগানের পরিমাণ যত খুশি বাড়ানো যেতে পারে। এক্ষেত্রে যোগান রেখা অনুভূমিক অক্ষের সমান্তরাল।

4.5. যোগানের দামগত স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ [Measurement of Price Elasticity of Supply]

যোগানের পরিমাণ ও দামের সামান্য পরিবর্তনের তুলনামূলক পরিমাপের জন্য যোগানের বিন্দুজ স্থিতিস্থাপকতার (point elasticity of supply) পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। যোগানের বিন্দুজ স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ পদ্ধতি নিম্নরূপ (চিত্র 4.13) ঃ

4.13 নং চিত্রে SS' যোগান রেখা। NT সরল রেখা SS'-কে A এবং C বিন্দুতে স্পর্শ করেছে। A এবং C বিন্দু দুটি এত কাছাকাছি অবস্থান করে যে, যোগান রেখার ঢাল ও NT রেখার ঢাল সমান। এখন যোগানের স্থিতিস্থাপকতার সূত্র অনুযায়ী —

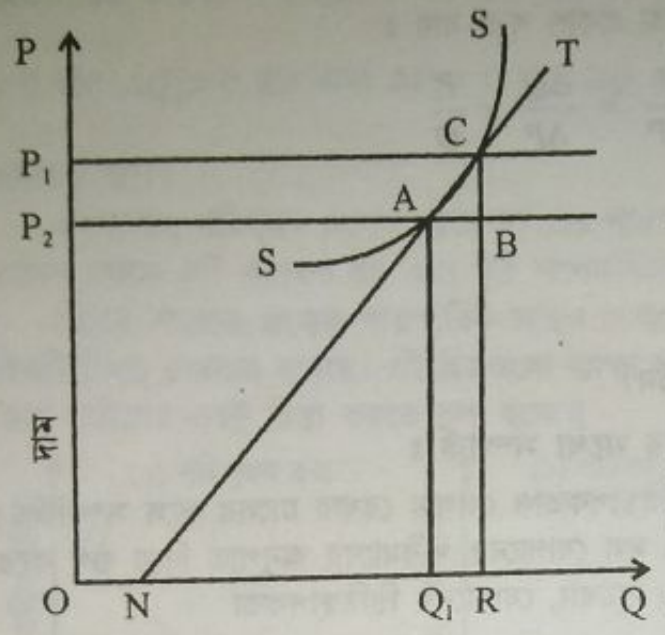

চিত্র 4.13 : যোগানের স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ

$$E_S = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \times \frac{P}{Q} = \frac{AB}{BC} \times \frac{QA}{OO}.$$

ABC এবং NQA দুটি সদৃশ ত্রিভুজ। সুতরাং $\frac{AB}{BC}$-এর পরিবর্তে $\frac{NQ}{QA}$ লেখা যায়। অতএব,

$$E_S = \frac{NQ}{QA} \times \frac{QA}{OQ} = \frac{NQ}{OQ}.$$

চিত্রে $NQ < OQ$। সুতরাং, A বিন্দুতে যোগানের স্থিতিস্থাপকতার মান একের কম ($E_S < 1$) অর্থাৎ যোগান অস্থিতিস্থাপক।

NT রেখাটি যদি যোগানরেখাকে কোন বিন্দুতে স্পর্শ করে এবং উৎপত্তিস্থলের মধ্যে দিয়ে চলে যায় তবে ঐ বিন্দুতে যোগান একক স্থিতিস্থাপক ($E_S = 1$)। আবার NT রেখাটি যদি যোগানরেখাকে কোন বিন্দুতে স্পর্শ করে উল্লম্ব রেখার মধ্যে দিয়ে চলে যায় তবে স্থিতিস্থাপকতার মান একের বেশি ($E_S > 1$) অর্থাৎ, যোগান স্থিতিস্থাপক।

এভাবে যোগানরেখার যে কোন বিন্দুতে স্পর্শক টেনে ঐ বিন্দুতে যোগানের দাম স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করা হয়।

ধরা যাক, যোগান রেখা সরলরৈখিক। 4.14 নং চিত্রে তিনটি সরলরৈখিক যোগানরেখা S_1, S_2, S_3 দেখানো হয়েছে। এখন আমরা বলতে পারি যে, S_2 যোগানরেখার স্থিতিস্থাপকতার মান একের কম এবং S_3 রেখার স্থিতিস্থাপকতার মান একের বেশি। যোগানের স্থিতিস্থাপকতা মূলত যোগানরেখার ঢালের ওপর নির্ভর করে। যোগানরেখার ঢাল $\frac{\Delta P}{\Delta Q}$। অতএব 4.14 নং চিত্রে S_1 যোগানরেখার ঢাল $\frac{\Delta P}{\Delta Q}$ এবং যোগানের স্থিতিস্থাপকতার সূত্র অনুযায়ী—

$$\frac{\Delta Q}{\Delta P} = \frac{1}{\text{যোগানরেখার ঢাল}} = \frac{1}{\frac{AB}{BO}} = \frac{BO}{AB}.$$

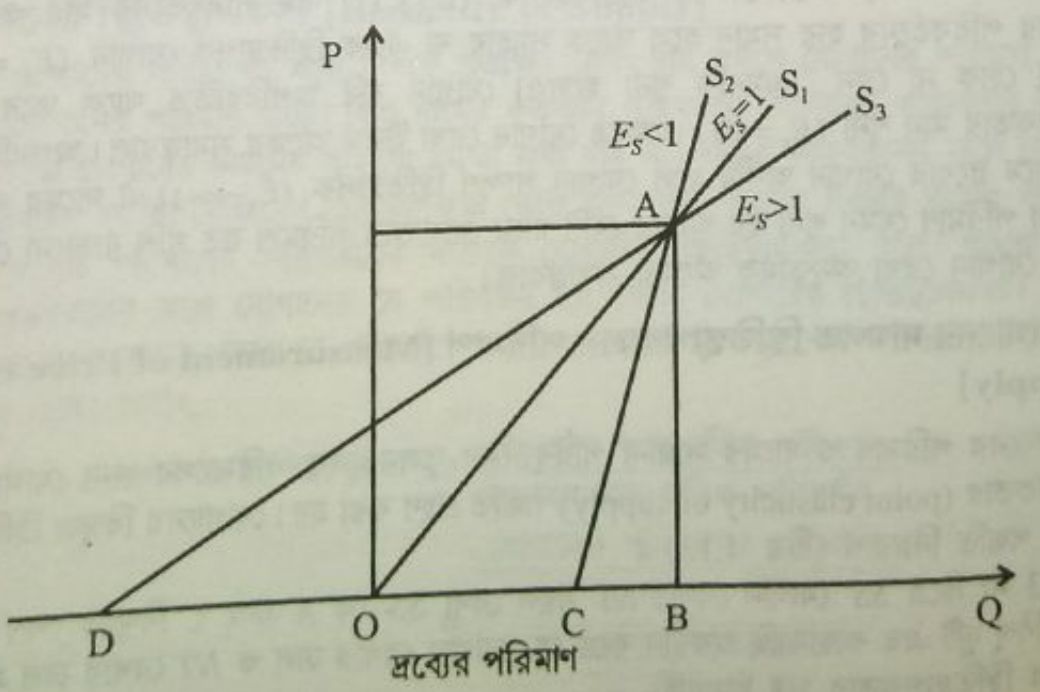

চিত্র 4.14 : যোগানের স্থিতিস্থাপকতা

অতএব, S_1 যোগানরেখার স্থিতিস্থাপকতা,

$$E_S = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P}{Q} = \frac{BO}{AB} \cdot \frac{AB}{BO} = 1$$

সুতরাং, S_1 যোগানরেখার স্থিতিস্থাপকতার মান এক।

S_3 যোগানরেখা দাম অক্ষের ধনাত্মক অংশে ছেদ করায় ঐ রেখার যোগানের স্থিতিস্থাপকতার মান একের বেশি। S_3 যোগানরেখার ঢাল $\frac{AB}{DB}$ এবং $\frac{\Delta Q}{\Delta P}$ হল $\frac{DB}{AB}$.

অতএব, $E_S = \frac{DB}{AB} \cdot \frac{AB}{OB} = \frac{DB}{OB}$.

যেহেতু DB. OB-এর তুলনায় বড়, সেহেতু স্থিতিস্থাপকতার মান একের বেশি।

পরিশেষে, S_2 যোগানরেখার ঢাল হল $\frac{AB}{CB}$ এবং $\frac{\Delta Q}{\Delta P}$ হল $\frac{CB}{AB}$.

অতএব, $E_S = \frac{CB}{AB} \cdot \frac{AB}{OB} = \frac{CB}{OB}$.

যেহেতু, CB, OB-এর তুলনায় ছোট, সেহেতু ঐ রেখার যোগানের স্থিতিস্থাপকতার মান একের কম।

4.6. যোগানের স্থিতিস্থাপকতা নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ [Determinants of the Elasticity of Supply]

যে কোন দ্রব্যের যোগানের স্থিতিস্থাপকতা কয়েকটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। তার মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঃ

[1] দ্রব্যের প্রকৃতি ঃ যেহেতু একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোন দ্রব্যের যোগানের পরিমাণ = উৎপাদন ± মজুত মাল, সেহেতু যে সব দ্রব্য মজুত করে রাখা যায় তাদের যোগান স্থিতিস্থাপক হয়। ঐ সব ক্ষেত্রে যোগান অধিকাংশ ক্ষেত্রে দামের ওপর নির্ভর করে। যেমন—মোটরগাড়ি, সোনা, আসবাবপত্র, ইত্যাদি। এইসব স্থায়ী দ্রব্যের যোগান সাধারণত স্থিতিস্থাপক। অন্যদিকে যে সব দ্রব্য মজুত করে রাখা যায় না তাদের যোগান অস্থিতিস্থাপক। যেমন—ফল, তরিতরকারী, শাকসবজি, দুধ, মাছ, মাংস ইত্যাদি। এইসব দ্রব্য একবার বাজারে এসে গেলে আর ফেরত নিয়ে যাওয়া যায় না। যে কোন দামেই এগুলো বিক্রি করে দিতে হয়। সুতরাং অস্থায়ী বা পচনশীল দ্রব্যের যোগান অস্থিতিস্থাপক। এ ছাড়া যে সব দ্রব্য পুনরায় উৎপাদন করা সম্ভব নয় তাদের যোগান সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক।

[2] উপকরণগুলোর যোগান ঃ কোন দ্রব্যের যোগান দ্রব্যটি তৈরি করতে যে সব উপাদান লাগে তাদের যোগানের ওপরও নির্ভর করে। যেমন— ইস্পাত তৈরি করতে হলে দরকার আকরিক লোহা আর সিমেন্ট তৈরি করতে গেলে প্রয়োজন লাইম স্টোন। যদি ইস্পাতের দাম বাড়ে তাহলে উৎপাদন ও যোগান বৃদ্ধি পাবে। তবে কতটা বৃদ্ধি পাবে তা অনেকাংশে নির্ভর করে আকরিক লোহার যোগানের ওপর। এটি আবার নির্ভর করে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর। যদি দেশে অসীম উৎপাদন ক্ষমতা থাকে, এবং অনেক উপকরণ ব্যবহৃত না হয়ে পড়ে থাকে তাহলে অতি সহজেই এগুলো ব্যবহার করে যে কোন দ্রব্যের যোগান বৃদ্ধি করা যায়। কিন্তু যদি অর্থ-ব্যবস্থা পুনর্নিয়োগ অবস্থায় ইতিমধ্যে উপনীত হয়ে থাকে তাহলে কেবল একটি দ্রব্যের যোগান হ্রাস করে অন্য একটি দ্রব্যের যোগান বাড়ানো সম্ভব।

[3] উপকরণগুলোর মধ্যে পরিবর্ততার সম্ভাবনা ঃ যোগান বাড়াতে গেলে উৎপাদন বাড়াতে হয়। আর উৎপাদন বাড়াতে হলে দরকার উপকরণের। যদি বিভিন্ন উপকরণকে একে অপরের পরিবর্ত হিসাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয় তাহলে কোন দ্রব্যের দাম বাড়লে অতি অল্প সময়ের মধ্যে যোগান বাড়ানো সম্ভব। কিন্তু যদি কোন দ্রব্যের উৎপাদন এমন একটি উপকরণের ওপর নির্ভর করে যার পরিবর্তে অন্য কোন উপকরণ ব্যবহার করা যায় তাহলে দ্রব্যটির যোগান অস্থিতিস্থাপক হবে। যেমন—কোন পেট্রল পাম্পের কথা ধরা যাক। যদি হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে যায় তাহলে হাত দিয়ে মেশিন চালিয়ে গাড়িতে পেট্রল ভরা যায়। তাই পেট্রলের যোগান খুব একটা কমে না। কেবল একই পরিমাণ তেল ভরতে সময় একটু বেশি লাগে। অপরদিকে কাশ্মিরী শাল তৈরি করতে মানুষের হাতের কাজ ও দক্ষতার দরকার। তাই দাম বাড়লেও অল্প সময়ের মধ্যে যোগান বাড়ানো সম্ভব নয়। কারণ মেশিন দিয়ে দ্রব্যটি তৈরি করা যায় না।

[4] উৎপাদন ব্যয়ের আচরণ ঃ যোগানের স্থিতিস্থাপকতা উৎপাদন ব্যয়ের আচরণের ওপরও নির্ভর করে। যদি কোন দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির সংগে একক প্রতি ব্যয় না বাড়ে তাহলে দ্রব্যটির যোগান অনেকটা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। অপরদিকে কোন দ্রব্যের অতিরিক্ত একক উৎপাদন করতে হলে যদি উৎপাদন ব্যয় ক্রমশই বাড়তে থাকে তাহলে বেশি দামেও দ্রব্যটি বিক্রি করা খুব একটা লাভজনক হবে না। এই অবস্থায় উৎপাদকরা যোগান বাড়াতে খুব একটা আগ্রহী হবে না। এক্ষেত্রে যোগান অস্থিতিস্থাপক হবে।

[5] সময়ের দৈর্ঘ্য ঃ যোগানের স্থিতিস্থাপকতা সময়ের দৈর্ঘ্যের ওপরও নির্ভর করে। স্বল্পকালে যখন উৎপাদন ক্ষমতার একটা সীমা থাকে, তখন খুব বেশি উৎপাদন ও যোগান বৃদ্ধি সম্ভব নয়। কিন্তু দীর্ঘকালে উৎপাদন ক্ষমতা বা উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের আয়তন বাড়ানো যায় এবং একটি উপকরণের পরিবর্তে অপর একটি উপকরণ ব্যবহার করা যায়। বস্তুত দীর্ঘকালে উৎপাদনের সকল উপকরণই পরিবর্তনশীল। এই দুটি কারণে দীর্ঘকালে যোগান বেশি স্থিতিস্থাপক হয়। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝানো যায়। ধরা যাক, কলকাতায় ভীষণ বিদ্যুৎ সংকট শুরু হয়েছে। ফলে মোমবাতির চাহিদা অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে। যাঁদের কাছে মোমবাতি মজুত করা আছে তারা এই মজুত মাল থেকেই বেশি করে মোমবাতি বাজারকে যোগান দেবে। স্বল্পকালে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সীমিত উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু নতুন উৎপাদন ক্ষমতা সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। তবে মোমবাতির চাহিদা ও দাম যদি ক্রমাগত বাড়তে থাকে তাহলে দীর্ঘকালে নতুন উৎপাদন ক্ষমতা সৃষ্টি করে উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। তাই নতুন নতুন মোমবাতির কারবার গড়ে উঠবে। অর্থাৎ নতুন ফার্ম শিল্পে প্রবেশ করবে। এমনকি অনেকেই অন্য ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে মোমবাতির ব্যবসা শুরু করবে। ফলে মোমবাতির যোগান অনেকটা বৃদ্ধি পাবে।

[6] ভবিষ্যতে দাম পরিবর্তনের সম্ভাবনা ঃ পরিশেষে, যোগানের স্থিতিস্থাপকতা ভবিষ্যতে দাম পরিবর্তন সম্পর্কে উৎপাদকদের প্রত্যাশার ওপরও নির্ভর করে। ধরা যাক, কোন দ্রব্যের দাম হঠাৎ বাড়ল। এই অবস্থায় উৎপাদকরা যদি আশা করে যে, অদূর ভবিষ্যতে দাম আর বাড়বে না তাহলে বাড়তি দামে তারা যোগানের পরিমাণ বাড়াবে। অপরদিকে যদি তারা আশা করে যে, ভবিষ্যতে দাম আরো বাড়বে তাহলে তারা দাম বাড়া সত্ত্বেও বেশি করে দ্রব্যসামগ্রী যোগান দেবে না। সুতরাং যোগানের স্থিতিস্থাপকতা শুধু এককালীন বা তাৎক্ষণিক দামবৃদ্ধির ওপর নির্ভর করে না। এটি দাম পরিবর্তন সম্পর্কে উৎপাদকদের মনে যে আশা-প্রত্যাশার সৃষ্টি হচ্ছে তার ওপরও অনেকটা নির্ভর করে।

[7] বিকল্প বাজারের সংখ্যা ঃ যে দ্রব্যের বাজারের সংখ্যা যত বেশি, সেই দ্রব্যের যোগানের স্থিতিস্থাপকতা তত বেশি ($E_s > 1$)। কোন বাজারে ঐ দ্রব্যের দাম হ্রাস পেলে বিক্রেতা অন্য বাজারে ঐ দ্রব্যটি বিক্রি করে। এছাড়া, উৎপাদনের কলাকৌশলের পরিবর্তন, উৎপাদনের সাজসরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ও পদ্ধতির পুনর্বিন্যাস যোগানের স্থিতিস্থাপকতাকে প্রভাবিত করে।

৭·১. ফার্মের মোট আয় ও তার পরিবর্তন ঃ

কোন ফার্ম একটি দ্রব্য উৎপাদন করে এবং সেই দ্রব্যটি বাজারে বিক্রয় করে। এইভাবে ফার্ম যে অর্থ পায় তাকেই ফার্মের আয় বা রেভিনিউ বলা হয়।

আমরা যদি ধরি R = রেভেনিউ বা আয়,

P = দ্রব্যের দাম

এবং Q = দ্রব্যের পরিমাণ,

তাহলে বলতে পারি $R = P\,Q$

38

P বা দাম যদি ১০ টাকা এবং Q বা বিক্রয়ের পরিমাণ যদি ৫০ একক হয়, তাহলে মোট আয় বা R=১০ টাকা × ৫০= ৫০০ টাকা হবে। অর্থাৎ **বিক্রয়ের মোট পরিমাণকে প্রতি একক দ্রব্যের দাম দিয়ে গুণ করলে আমরা ফার্মের মোট আয়ের হিসেব পাই।**

$R=P.Q$ থেকে বোঝা যাচ্ছে R নির্ভর করে (ক) দাম বা P-এর উপর এবং (খ) বিক্রয়ের পরিমাণ বা Q-এর উপর।

অতএব R বাড়বে যদি (১) P বাড়ে কিন্তু Q স্থির থাকে কিংবা, (২) Q বাড়ে কিন্তু P স্থির থাকে, কিংবা (৩) P এবং Q উভয়েই বাড়ে। আমরা আলোচনার সুবিধার জন্য ধরে নেব যে দ্রব্যের দাম স্থির আছে। তাহলে রেভেনিউ বা R কেবলমাত্র বিক্রয়ের পরিমাণ বা Q-এর উপর নির্ভর করবে। Q বাড়লে R বাড়বে, Q কমলে R কমবে। আমরা লিখতে পারি $R=f(Q)$.

ফার্ম যে দ্রব্য উৎপাদন করে তার একটি অংশ মজুত ভাণ্ডারে রেখে দেয় এবং বাকিটা বাজারে বিক্রয়ের জন্য নিয়ে যায়। ফার্মের মজুত ভাণ্ডারকে Inventory বলা হয়। অবশ্য এই মজুত ভাণ্ডারের মধ্যে উৎপন্ন দ্রব্য ছাড়াও কাঁচামাল কিংবা মধ্যবর্তী দ্রব্য থাকতে পারে। আমরা বলতে পারি ফার্মের মোট উৎপাদন=মজুত+যোগান।

যদি ফার্মের কোন মজুত নেই বলে ধরে নিই, তাহলে উৎপাদন ও যোগান সমান হয়। উৎপাদন বাড়লে বা কমলে যোগান বা বিক্রয়ও বাড়বে বা কমবে। এখানে $R=P.Q$ এবং P স্থির আছে বলে ধরা হচ্ছে। কাজেই Q যে হারে পরিবর্তিত হবে R সেই হারে পরিবর্তিত হবে। এখানে মোট আয় রেখাটি হবে একটি ঊর্ধ্বমুখী সরলরেখা।

যদি দাম স্থির না থাকে, তাহলে মোট আয় হবে $R=PQ$ এবং স্পষ্টত R নির্ভর করবে P ও Q উভয়ের উপর। এখানে মোট আয় রেখার আকৃতি নিরূপণ করার জন্য দাম (P) ও বিক্রয় (Q) উভয়ের পরিবর্তন জানতে হবে। **এই পরিবর্তনটি নির্ভর করবে দ্রব্যের চাহিদা ও তার স্থিতিস্থাপকতার উপর।** চাহিদার নিয়ম অনুযায়ী P কমলে Q বাড়বে, P বাড়লে Q কমবে, কিন্তু $P\,Q=R$ বাড়তে পারে, স্থির থাকতে পারে কিংবা কমে যেতে পারে।

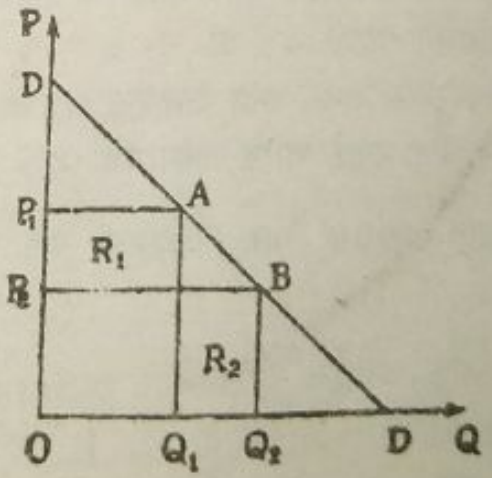

৭·১ রেখাচিত্র : দাম ও মোট আয়ের পরিবর্তন

রেখাচিত্রের সাহায্যে ব্যাপারটি বোঝান যায়। ৭·১ নং রেখাচিত্রে এটি দেখানো হল

এখানে DD′ হল চাহিদা রেখা। দাম যদি OP_1 হয় তাহলে বিক্রয় হবে OQ_1 এবং মোট আয় হবে $OP_1 \times OQ_1 = OP_1AQ_1 = R_1$. আবার দাম যদি OP_2 এবং বিক্রয় যদি OQ_2 হয়, তাহলে মোট আয় হবে $R_2 = OP_2 \times OQ_2$। এখানে বিক্রয়ের পরিমাণ OQ_1 থেকে বেড়ে OQ_2 হল ; মোট আয় R_1 থেকে পরিবর্তিত হয়ে R_2 হল। এখন দাম কমার জন্য এবং বিক্রয় বেড়ে যাওয়ার জন্য মোট আয় R_2 পূর্বের মোট আয় R_1 থেকে বাড়ল, কি কমল তা DD′ রেখার স্থিতিস্থাপকতার উপর নির্ভর করবে। যদি দাম কমে ও বিক্রয় বাড়ে তাহলে $R_2 > R_1$ হবে, যদি স্থিতিস্থাপকতা $e > 1$ হয়,

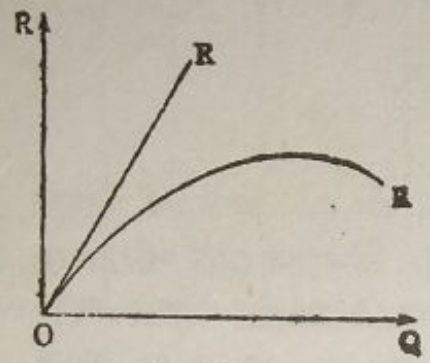

৭·২ রেখাচিত্র : স্থির ও ক্রমহ্রাসমান দামে মোট আয় রেখা

$R_2 = R_1$ হবে যদি $e = 1$ হয়
এবং $R_2 < R_1$ হবে যদি $e < 1$ হয়।

এত সব জটিলতা বাদ দিয়ে আমরা বলতে পারি ফার্মের মোট আয় বিক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়বে এবং বিক্রয় বাড়লে দাম যেহেতু কমবে অতএব মোট আয় বিক্রয়ের পরিমাণের সঙ্গে তাল রেখে সমান হারে বাড়বে না। রেখাচিত্রের ভাষায় বলা যায় মোট আয় রেখা ঊর্ধ্বমুখী সরলরেখা হয় না। যেখানে দাম কমে সেখানে মোট আয় রেখাটি পরিমাণ-অক্ষের দিকে অবতল হয়। আমাদের ৭·২ নং চিত্রে QR হল মোট আয় রেখা যেখানে দাম স্থির থাকে এবং OR′ হল মোট আয় রেখা যেখানে দাম কমে।

অর্থাৎ উপরের OR হল স্থির দামে মোট আয় রেখা। OR′ হল ক্রমহ্রাসমান দামে মোট আয় রেখা।

৭·২· গড় আয় ও প্রান্তিক আয় কাকে বলে ?

(ক) **গড় আয় ঃ কোন ফার্ম দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করে বিক্রীত দ্রব্যের প্রতি এককের জন্য যে পরিমাণ আয় বা রেভেনিউ পেয়ে থাকে, তাকে গড় আয় বলা হয়।** কোন ফার্ম যদি ১০ একক দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করে মোট ১৭৫ টাকা পেয়ে থাকে, তাহলে প্রতি একক দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য সেই ফার্ম পায় ১৭৫ টাকা ÷ ১০ = ১৭·৫ টাকা।

ধরা যাক, কোন একজন বিক্রেতা প্রথমে একটি দ্রব্য বিক্রয় করে ১০ টাকা পেল। দ্বিতীয় বারে সেই দ্রব্যটি বিক্রয় করে ৮ টাকা এবং তৃতীয় বারে পেল ৩ টাকা। তাহলে তিনটি বা তিন একক দ্রব্য বিক্রয় করে সেই বিক্রেতা পেল ২১ টাকা। তাহলে প্রতি একক দ্রব্য বিক্রয় করে বিক্রেতা গড়ে ২১ টা· ÷ ৩= ৭ টাকা পায়। এই ৭ টাকা হল তার গড় আয়।

এখানে লক্ষ্য করা যায় যে, গড় আয় একটি আঙ্কিক গড় মাত্র। এটা কোন এককের প্রকৃত দাম নাও হতে পারে। ফার্মের মোট আয়কে বিক্রয়ের পরিমাণ দ্বারা ভাগ করলে গড় আয়ের হিসাব পাওয়া যায়। আমরা বলতে পারি গড় আয় $= \frac{\text{মোট আয়}}{\text{বিক্রয়ের পরিমাণ}}$।

গড় আয়কে ইংরেজীতে Average Revenue বা A. R. বলা হয়। মোট আয়কে Total Revenue বা T. R. বা R বলা যেতে পারে।

যদি R = মোট আয়
এবং Q = বিক্রয়ের পরিমাণ হয়,

তাহলে গড় আয় (A.R.) $= \frac{R}{Q}$.

আবার, P=দাম হলে, মোট আয়=P.Q হবে।

অর্থাৎ R=P.Q. অতএব গড় আয় (A.R.) $= \frac{PQ}{Q} = P$. অর্থাৎ A.R.=P.

বা, গড় আয়=দাম।

অতএব, **দ্রব্যের দাম ও বিক্রেতার গড় আয় একই ব্যাপার। দামকে ক্রেতার দিক থেকে দেখা হয়; গড় আয়কে দেখা হয় বিক্রেতার দিক থেকে।**

(খ) প্রান্তিক আয়ঃ অতিরিক্ত এক একক দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করে ফার্ম যে আয় পেয়ে থাকে তাকে প্রান্তিক আয় বলা হয়। যেমন, কোন ফার্ম ১০ একক দ্রব্য উৎপাদন করে যদি ১০০ টাকা পায় এবং ১৫ একক দ্রব্য উৎপাদন করে ১৪০ টাকা পায়, তাহলে বোঝা যাচ্ছে ফার্মটি অতিরিক্ত ৫ একক উৎপাদন করে ৪০ টাকা আয় বেশি পায়। তাহলে অতিরিক্ত ১ একক উৎপাদন ও বিক্রয় করে ফার্মটি পায় $\frac{৪০ \text{ টাকা}}{৫} = ৮$ টাকা। এখানে ফার্মের প্রান্তিক আয় হল ৮ টাকা। ফার্মটি যদি অতিরিক্ত $\triangle Q$ একক দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করে অতিরিক্ত $\triangle R$ পরিমাণ আয় পেয়ে থাকে, তাহলে তার প্রান্তিক আয় হয় $\frac{\triangle R}{\triangle Q}$. অতএব ফার্মের প্রান্তিক আয়= $\frac{\text{মোট আয়ের পরিবর্তন}}{\text{মোট বিক্রয়ের পরিবর্তন}}$। আমরা যদি ধরে নিই যে, অতিরিক্ত বিক্রয়ের পরিমাণ $\triangle Q$ খুবই ছোট, তাহলে $\frac{\triangle R}{\triangle Q}$ ভগ্নাংশটি একটি নির্দিষ্ট সীমান্তিক পরিমাণে পরিণত হয় এবং তাকে $\frac{dR}{dQ}$ হিসেবে লেখা হয়। সঠিক অর্থে প্রান্তিক আয় হয় $\frac{dR}{dQ}$, অর্থাৎ উৎপাদন বা বিক্রয়ের ক্ষুদ্রতম পরিবর্তন বা বৃদ্ধির জন্য মোট আয়ের পরিবর্তন হল প্রান্তিক আয়। একেই মোট আয়ের পরিবর্তনের হার বলা হয়। অতএব **প্রান্তিক আয় হল ফার্মের মোট আয়ের পরিবর্তনের হার।**

অন্যভাবে আরো সহজ করে প্রান্তিক আয়ের সংজ্ঞা দেওয়া যায়। ধরি কোন ফার্ম ৯ একক দ্রব্য বিক্রয় করে মোট আয় পেয়ে থাকে ১০০ টাকা এবং ১০ একক দ্রব্য বিক্রয় করে পেয়ে থাকে ১১০ টাকা। অতএব দশম একক দ্রব্যের বিক্রয় থেকে তার প্রান্তিক আয় হল ১১০ টাকা−১০০ টাকা=১০ একক বিক্রয়ের মোট আয়−৯ একক বিক্রয়ের মোট আয়। তাহলে আমরা পাই n-তম এককের প্রান্তিক আয়=n একক দ্রব্য বিক্রয়ের মোট আয়−(n−1) একক দ্রব্য বিক্রয়ের মোট আয়। অর্থাৎ n-তম এককের প্রান্তিক আয়=$R_n - R_{n-1}$। এখানে R_n=n একক দ্রব্য বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত মোট আয় এবং R_{n-1}=n−1 একক দ্রব্য বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত মোট আয়।

(গ) গড় ও প্রান্তিক আয় থেকে কীভাবে মোট আয় জানা যায়?

মোট আয় থেকে যেমন গড় ও প্রান্তিক আয় জানা যায়, সেইরূপ গড় ও প্রান্তিক আয়

থেকেও মোট আয় জানা যায়। নিয়মের আকারে বলা যায়—

(ক) গড় আয়কে বিক্রয়ের পরিমাণ দিয়ে গুণ করলে মোট আয় পাওয়া যায়, এবং

(খ) প্রতি একক দ্রব্যের বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত প্রান্তিক আয়কে যোগ করে মোট আয় পাওয়া যায়।

উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে। ধরি, কোন ফার্ম ১০ একক দ্রব্য বিক্রয় করল এবং গড় আয় পেল ১৫ টাকা। তাহলে ফার্মের মোট আয় হবে ১০ × ১৫ টা·=১৫০ টা·। আবার ধরা যাক কোন ফার্ম প্রথম একক দ্রব্য বিক্রয় করে ১০ টাকা, দ্বিতীয় একক থেকে ৮ টাকা, তৃতীয় একক থেকে ৬ টাকা প্রান্তিক আয় পেল। এখানে মোট আয় হবে ১০ টা·+৮ টা· + ৬ টা·=২৪ টাকা। তাহলে আমরা পাই— **গড় আয়কে গুণ করলে এবং প্রান্তিক আয়কে যোগ করলে মোট আয় পাওয়া যায়।** রেখাচিত্রের সাহায্যেও এই ব্যাপারটি বোঝানো যায়।

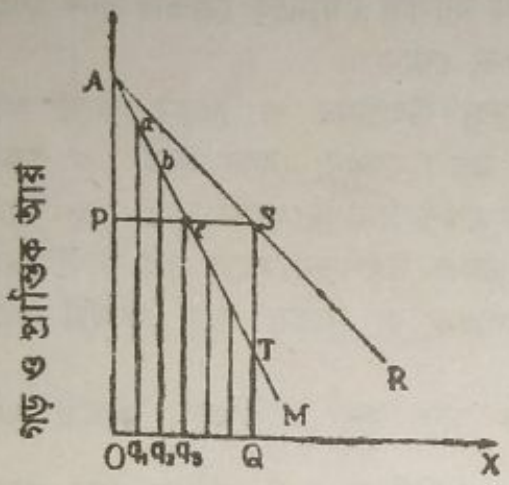

৭·৩ রেখাচিত্র : গড় ও প্রান্তিক আয় রেখা থেকে মোট আয়ের পরিমাপ

৭·৩ নং রেখাচিত্রে AR হল গড় আয় রেখা এবং AM হল প্রান্তিক আয় রেখা। ধরি উৎপাদন=OQ, তাহলে গড় আয়=QS। S বিন্দু থেকে OY-অক্ষের উপর SP লম্ব আঁকা হল। OPSQ একটি আয়তক্ষেত্র। এর বিপরীত বাহু সমান।

অতএব SQ=OP, অর্থাৎ গড় আয়=OP.

ফার্মটি OQ পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করে প্রতি একক উৎপাদনের জন্য গড়ে OP পরিমাণ আয় পেয়ে থাকে। তাহলে ফার্মের মোট আয়=OP×OQ=OPSQ। এটা হল গড় আয় রেখা ধরে ফার্মের মোট আয়ের পরিমাপ। এখন প্রান্তিক আয় রেখা ধরে মোট আয় পরিমাপ করা যেতে পারে।

ধরি Oq_1 হল প্রথম একক দ্রব্য। তার জন্য ফার্মের প্রান্তিক আয় হল $OAaq_1$ নামক সরু ট্রাপিজিয়ামটি। দ্বিতীয় একক বিক্রয় করে প্রান্তিক আয় হয় q_1abq_2 ট্রাপিজিয়ামটি, তৃতীয় একক থেকে প্রান্তিক আয় হল q_2bcq_3 ট্রাপিজিয়ামটি। অতএব প্রথম তিন একক দ্রব্য বিক্রয় করে ফার্মের মোট আয় হয় $OAcq_3$ নামক ট্রাপিজিয়ামটি। এইভাবে বলা যায় ফার্মটি যদি OQ পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করে তাহলে তার মোট আয় হবে OATQ নামক ক্ষেত্রটি। বলা বাহুল্য এটিও একটি ট্রাপিজিয়াম। এখানে ফার্মের মোট আয় হবে OPSQ=OATQ.

৭·৩· ফার্মের গড় আয় ও প্রান্তিক আয়ের সম্পর্ক ঃ

কোন ফার্ম দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করে বিক্রীত দ্রব্যের প্রতি এককের জন্য গড়ে যে অর্থ পেয়ে থাকে তাকে বলা হয় গড় আয় এবং ফার্ম অতিরিক্ত এক একক দ্রব্য বিক্রয় করে যে অর্থ পায় তাকে বলা হয় প্রান্তিক আয়। এই গড় ও প্রান্তিক আয়ের মধ্যে নির্দিষ্ট সম্পর্ক আছে। আমরা কয়েকটি সূত্রে এই সম্পর্কটিকে প্রকাশ করতে পারি এবং প্রত্যেকটি সূত্রকে বোঝানোর জন্য একটি করে উদাহরণ নিতে পারি। প্রত্যেকটি উদাহরণ কাল্পনিক। উদাহরণ দিয়ে কোন বিষয় বোঝানো যায়, কিন্তু প্রমাণ করা যায় না। গড় ও প্রান্তিক আয়ের সম্পর্কের সূত্রগুলি প্রমাণ করতে হলে অঙ্কের প্রয়োজন। আমরা অঙ্ক এড়িয়ে কেবলমাত্র উদাহরণের সাহায্যে সম্পর্ক সূত্রগুলি আলোচনা করব।

প্রথমত, গড় আয় যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে প্রান্তিক আয়ও বৃদ্ধি পায় এবং অধিক হারে বৃদ্ধি পায়।

এখানে দুটো কথা বলা হচ্ছে। গড় আয় বৃদ্ধি পেলে প্রান্তিক আয় বৃদ্ধি পায়। শুধু তাই নয়, গড় আয় যে হারে বাড়ে প্রান্তিক আয় তার চেয়ে বেশি হারে বাড়ে। রেখাচিত্রের ভাষায় বলা যায়—**গড় আয় রেখা যদি উর্ধ্বমুখী হয় তাহলে প্রান্তিক আয় রেখাও উর্ধ্বমুখী হয় এবং প্রান্তিক আয় রেখা গড় আয় রেখার উপরে থাকে।** নীচের তালিকায় দেখা যাচ্ছে উৎপাদন ও গড় আয় ১, ২, ৩, ৪, ৫ এইভাবে যদি বাড়ে তাহলে প্রান্তিক আয় ১, ৩, ৫, ৭, ৯ ইত্যাদি ভাবে বাড়ে।

উদাহরণ ১ ঃ

১ নং তালিকা ঃ গড় ও প্রান্তিক আয়

উৎপাদন (Q)	গড় আয় (AR)	মোট আয় (TR)	প্রান্তিক আয় (MR)
১	১	১	১
২	২	৪	৩
৩	৩	৯	৫
৪	৪	১৬	৭
৫	৫	২৫	৯

দ্বিতীয় একক উৎপাদন থেকে প্রান্তিক আয় গড় আয়ের চেয়ে বেশি হয়ে যায় এবং এইজন্যই প্রান্তিক আয় রেখা MR গড় আয় AR-এর উপরে থাকে।

৭·৪ নং রেখাচিত্রে গড় আয় রেখা যখন উর্ধ্বমুখী হয়ে AR′ রেখা হয়েছে, তখন প্রান্তিক আয় রেখাও উর্ধ্বমুখী হয়েছে, এবং MR′ রেখা AR′ রেখার উপরে আছে।

দ্বিতীয়ত, **গড় আয় যখন হ্রাস পায় তখন প্রান্তিক আয় অধিক হারে হ্রাস পায়।** রেখাচিত্রের ভাষায় বলা যায়—**গড় আয় রেখা যখন নিম্নমুখী হয় তখন প্রান্তিক আয় রেখাও নিম্নমুখী হয় এবং প্রান্তিক আয় রেখা গড় আয় রেখার নীচে থাকে।**

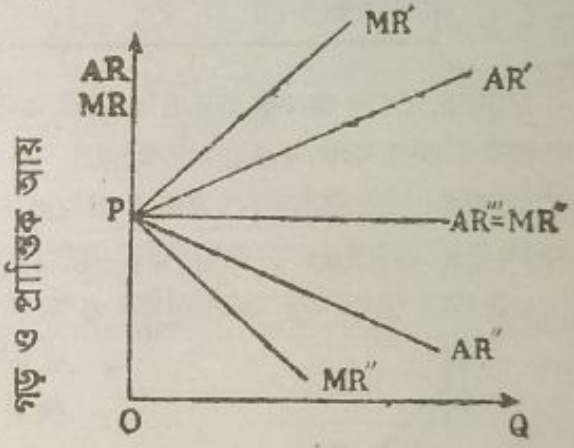

৭·৪ রেখাচিত্র : গড় ও প্রান্তিক আয়ের সম্পর্ক

উদাহরণ ২ ঃ

২ নং তালিকা ঃ গড় ও প্রান্তিক আয়

উৎপাদন (Q)	গড় আয় (AR)	মোট আয় (TR)	প্রান্তিক আয় (MR)
১	৫	৫	৫
২	৪	৮	৩
৩	৩	৯	১
৪	২	৮	−১
৫	১	৫	−৩

২ নং তালিকায় দেখা যাচ্ছে গড় আয় যখন ৫, প্রান্তিক আয় তখন ৫। এরপর গড় আয় যখন কমছে প্রান্তিক আয় তখন কমছে এবং তার চেয়ে বেশি কমছে। গড় আয় যখন ২, তখন প্রান্তিক আয় ঋণাত্মক হয়ে গেছে।

৭·৪ নং রেখাচিত্রে দেখা যাচ্ছে—গড় আয় রেখা AR″ যখন নিম্নমুখী হয়েছে তখন প্রান্তিক আয় রেখা MR″ AR″ রেখার নীচে আছে।

তৃতীয়ত, **গড় আয় যখন স্থির থাকে তখন প্রান্তিক আয় স্থির থাকে ; শুধু তাই নয়, তখন গড় ও প্রান্তিক আয় পরস্পর সমান হয়।** রেখাচিত্রের ভাষায় বলা যায়, গড় আয় রেখা উৎপাদন-অক্ষের সঙ্গে সমান্তরাল হলে প্রান্তিক আয় রেখা গড় আয় রেখার সঙ্গে মিলে যায়। তখন একটিমাত্র সমান্তরাল সরলরেখাই গড় ও প্রান্তিক আয় রেখার কাজ করে। ৭·৪ নং রেখাচিত্রে AR‴ রেখা OQ-অক্ষের সমান্তরাল। এখানে MR‴ রেখাও AR‴ রেখার সঙ্গে মিশে গেছে।

উদাহরণ ৩ ঃ

৩ নং তালিকা ঃ গড় ও প্রান্তিক আয়

উৎপাদন (Q)	গড় আয় (AR)	মোট আয় (TR)	প্রান্তিক আয় (MR)
১	১০	১০	১০
২	১০	২০	১০
৩	১০	৩০	১০
৪	১০	৪০	১০
৫	১০	৫০	১০

চতুর্থত, এবার আমরা গড় ও প্রান্তিক আয় রেখার মধ্যে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ জ্যামিতিক সম্পর্কের কথা বলব। জ্যামিতিকভাবে গড় ও প্রান্তিক আয়রেখা সরলরেখা কিংবা বক্ররেখা হতে পারে। গড় আয়রেখা বক্ররেখা হলে (ক) উত্তল বা (খ) অবতল হতে পারে। এখানে কেবলমাত্র সরলরেখার কথা বলা হচ্ছে। এক্ষেত্রে নিয়মটি হল—

গড় আয় রেখা যদি সরলরৈখিক ও নিম্নমুখী হয় তাহলে প্রান্তিক আয় রেখাও সরলরৈখিক ও নিম্নমুখী হয়। শুধু তাই নয়, সেক্ষেত্রে প্রান্তিক আয়-রেখা গড় আয়রেখা ও OY-অক্ষের সমদূরবর্তী হয়।

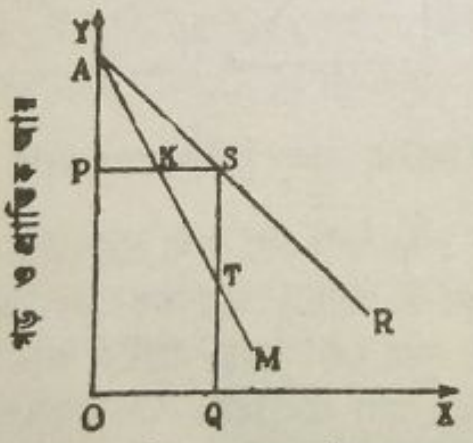

৭·৫ রেখাচিত্র : গড় ও প্রান্তিক আয় রেখার সম্পর্ক

পাশের রেখাচিত্রে AR হল একটি নিম্নমুখী ও সরলরৈখিক গড় আয়রেখা। এর উপর S একটি বিন্দু।S বিন্দু থেকে OY-অক্ষের উপর SP লম্ব অঙ্কন করা হল। এখানে AM হল প্রান্তিক আয়রেখা। AM রেখাটি SP লম্বকে K বিন্দুতে ছেদ করেছে। আমরা প্রমাণ করতে পারব যে, SK=KP। অর্থাৎ AM রেখা AR রেখা ও OY-অক্ষের সমদূরবর্তী হয়।

প্রমাণের জন্য S বিন্দু থেকে OX-অক্ষের উপর SQ লম্ব আঁকা হল। AM রেখা SQ লম্বকে T বিন্দুতে ছেদ করেছে। এখানে △APK ও △KST নামক দুটি ত্রিভুজ উৎপন্ন হয়েছে। আমরা যদি প্রমাণ করতে পারি যে, এই ত্রিভুজ দুটি সর্বসম, তাহলে SK=KP প্রমাণ করা যাবে।

এখানে উৎপাদন=OQ, গড় আয়=QS. অতএব মোট আয়=OQ×SQ=OPSQ.

এটা হল গড় আয়রেখা ধরে মোট আয়ের পরিমাপ। আমরা প্রান্তিক আয়রেখা ধরেও মোট আয় পরিমাপ করতে পারি। প্রান্তিক আয়রেখা ধরে পরিমাপ করলে মোট আয় হবে OATQ নামক ট্রাপিজিয়ামটি। উভয়ক্ষেত্রে মোট আয় সমান। অর্থাৎ OATQ=OPSQ. এখানে লক্ষ্য করা যায় যে, OATQ এবং OPSQ এই দুটি ক্ষেত্রের মধ্যে OPKTQ নামক ক্ষেত্রটি রয়েছে। অর্থাৎ OATQ=APK+OPKTQ এবং OPSQ=KST+OPKTQ.

এখন উভয় পক্ষ থেকে OPKTQ অংশটি বাদ দিলে আমরা পাই $\triangle APK = \triangle KST$. অর্থাৎ APK ও KST ত্রিভুজ দুটির ক্ষেত্রফল সমান। আবার ঐ ত্রিভুজ দুটির মধ্যে

$\angle APK = \angle KST$ (সমকোণ),
$\angle AKP = \angle SKT$ (বিপরীত কোণ),
$\angle PAK = \angle KTS$ (একান্তর কোণ)।

43

অতএব $\triangle APK \equiv \triangle KST$
অতএব $PK = KS$.

তাহলে প্রমাণিত হল যে, গড় আয়রেখা যখন নিম্নমুখী সরলরেখা হয় তখন প্রান্তিক আয় রেখা গড় আয়রেখা এবং OY অক্ষের সমদূরবর্তী হয়।

ফার্মের গড় আয়রেখা নিম্নমুখী সরলরেখা হলে প্রান্তিক আয়রেখাও নিম্নমুখী সরলরেখা হয় এবং প্রান্তিক আয়রেখা ফার্মের গড় আয়রেখা ও উল্লম্ব অক্ষের সমদূরবর্তী হয়। কিন্তু ফার্মের গড় আয়রেখা যে সর্বদাই নিম্নমুখী সরলরেখা হবে এমন কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। প্রকৃতপক্ষে ফার্মের গড় আয়রেখা নিম্নমুখী বক্ররেখাও হতে পারে।

ফার্মের গড় আয়রেখা বা AR রেখা নিম্নমুখী বক্ররেখা হলে রেখাটি রেখাচিত্রের মূলবিন্দুর দিকে অবতল হতে পারে কিংবা মূলবিন্দুর দিকে উত্তল হতে পারে। AR রেখা অবতল বা

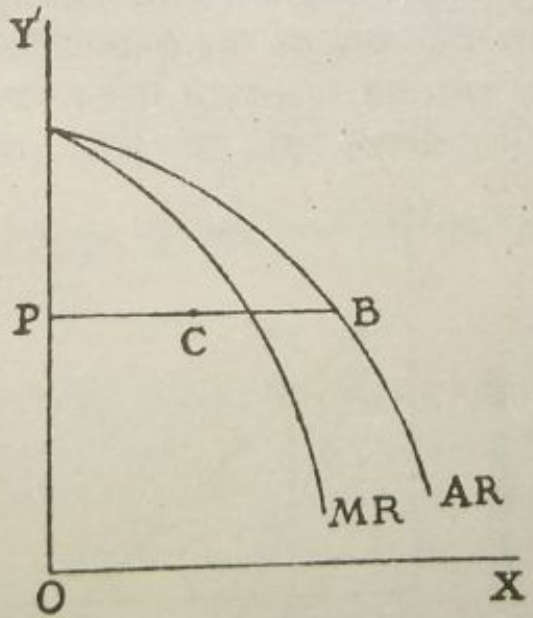

৭·৬ রেখাচিত্র : মূল বিন্দুর দিকে অবতল AR রেখা ও অবতল MR রেখা

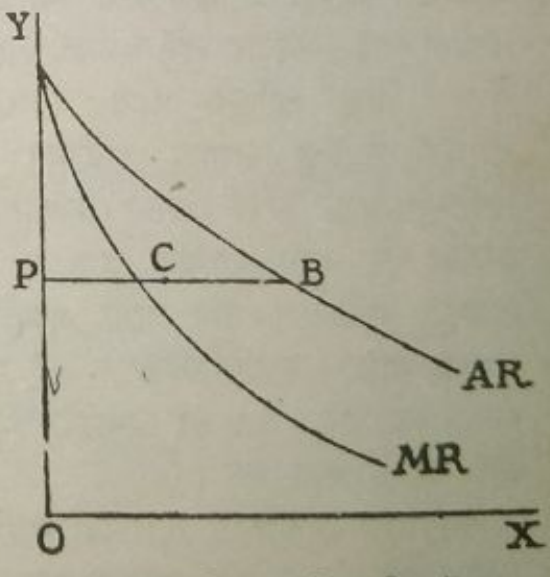

৭·৭ রেখাচিত্র : মূলবিন্দুর দিকে উত্তল AR রেখা ও MR রেখা

উত্তল হলে ফার্মের প্রান্তিক আয়রেখা বা MR রেখাও অনুরূপ বক্রতা প্রাপ্ত হয়। এক্ষেত্রে

অতএব AP=DR.

এখন D বিন্দুতে $e=\frac{DQ}{AP}=\frac{DQ}{DR}$ ($\because$ AP=DR)

অর্থাৎ $e=\frac{DQ}{DQ-RQ}$ ($\because$ DR=DQ−RQ) .

এখানে DQ=গড় আয়=AR
এবং RQ=প্রান্তিক আয়=MR.

অতএব আমরা পাই $e=\frac{AR}{AR-MR}$.

অতএব AR=e(AR−MR)
$\therefore$ AR=eAR−eMR
$\therefore$ eMR=eAR−AR
$\therefore$ eMR=AR (e−I)

$$\therefore MR=AR\left(\frac{e-I}{e}\right)=AR\left(I-\frac{I}{e}\right)$$

এটিই হল গড় আয়, প্রান্তিক আয় ও চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার সম্পর্ক। এই সম্পর্কটি থেকে পাই, যদি (ক) e=I হয়, তাহলে MR=0 হবে, (খ) e>1 হয়, তাহলে MR>0 হবে এবং (গ) e<1 হয়, তাহলে MR<0 হবে।

৭·৯ নং রেখাচিত্রে এটি দেখানো হল। ৭·৯ নং রেখাচিত্রে AB হল গড় আয়রেখা, AC হল প্রান্তিক আয়রেখা। D হল AB রেখার মধ্যবিন্দু। এখানে e=1. এর নীচে C বিন্দুতে প্রান্তিক আয়রেখা OX-অক্ষকে ছেদ করেছে। অর্থাৎ প্রান্তিক আয় শূন্য। D বিন্দুর বাম দিকে e>1, কাজেই প্রান্তিক আয় ধনাত্মক। D বিন্দুর ডান দিকে e<1, কাজেই প্রান্তিক আয় ঋণাত্মক।

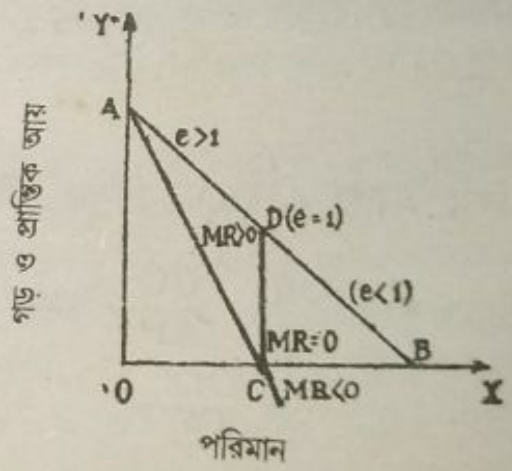

৭·৯ রেখাচিত্র : ফার্মের গড় আয়, প্রান্তিক আয় ও চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতার সম্পর্ক

গড় আয়, প্রান্তিক আয় এবং চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতার সম্পর্কটিকে আমরা অঙ্কের সাহায্যে অত্যন্ত সহজভাবে প্রমাণ করতে পারি।

ধরা যাক P=দাম, $\triangle$P=P-এর পরিবর্তন,
Q=চাহিদা, $\triangle$Q=Q-এর পরিবর্তন,
e=চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতা,
AR=গড় আয় এবং MR=প্রান্তিক আয়,
R=মোট আয় এবং $\triangle$R=R-এর পরিবর্তন।

তাহলে আমরা পাই, $e=-\frac{P}{Q}\cdot\frac{\triangle Q}{\triangle P}$

অতএব $\frac{1}{e} = -\frac{Q}{P} \cdot \frac{\Delta P}{\Delta Q}$.

আবার, $R=P.Q.$ (মোট আয় হল দাম ও পরিমাণের গুণফল)

অতএব, $\Delta R = P\Delta Q + Q.\Delta P$

$\therefore \frac{\Delta R}{\Delta Q} = P + Q. \frac{\Delta P}{\Delta Q}$ (উভয় পক্ষকে ΔQ দ্বারা ভাগ করে)

(আমরা জানি $AR = \frac{R}{Q} = \frac{P.Q}{Q} = P$ এবং $MR = \frac{\Delta R}{\Delta Q}$.

অতএব, $MR = P + Q. \frac{\Delta P}{\Delta Q}$.

$MR = P + \frac{Q}{P} \cdot \frac{\Delta P}{\Delta Q} \cdot P$ (ডান দিকের দ্বিতীয় পদকে P দ্বারা গুণ ও ভাগ করে)

$MR = P\left(1 + \frac{Q}{P} \quad \frac{\Delta P}{\Delta Q}\right)$

$\therefore MR = AR\left[1 - \left(-\frac{Q}{P} \cdot \frac{\Delta P}{\Delta Q}\right)\right]$

$\therefore MR = AR\left(1 - \frac{1}{e}\right)$ প্রমাণিত হল।

৭·৫· ফার্মের মোট আয় রেখা থেকে কীভাবে প্রান্তিক আয় ও গড় আয় নিরূপণ করা যায়।

(ক) ফার্মের মোট আয়রেখা যদি ঊর্ধ্বমুখী সরলরেখা হয়, তাহলে উৎপাদন বা বিক্রয় যে হারে বাড়ে মোট আয়ও সেই হারে বাড়ে। কাজেই গড় আয় ও প্রান্তিক আয় স্থির থাকে। এখানে গড় ও প্রান্তিক আয় রেখা উৎপাদন অক্ষের সঙ্গে সমান্তরাল হয়।

৭·১০ নং রেখাচিত্রে OR হল মোট আয় রেখা। এর উপর A একটি বিন্দু। A বিন্দুতে উৎপাদন $=OQ$ এবং মোট আয় $=AQ$.

অতএব গড় আয় $=\frac{AQ}{OQ} = OR$ রেখার ঢাল। আবার, OR রেখার উপর যদি আর একটি বিন্দু A′ নিই, তাহলে উৎপাদন হয় OQ′ এবং মোট আয় হয় A′O′. কাজেই A′ বিন্দুতে গড় আয় হয়

A′ বিন্দুতে গড় আয় হয় $\frac{A'Q'}{OQ'} = OR$ রেখার ঢাল। এইভাবে দেখা যায়— **মোট আয়রেখা যেখানে ঊর্ধ্বমুখী সরলরেখা হয় সেখানে গড় আয় সকল সময় সমান থাকে। কাজেই গড় আয়রেখাটি উৎপাদন পরিমাপক অক্ষের সঙ্গে সমান্তরাল হয়।** ৭·১০ নং রেখাচিত্রে RR′ রেখাটি হল এরূপ একটি গড় আয় রেখা।

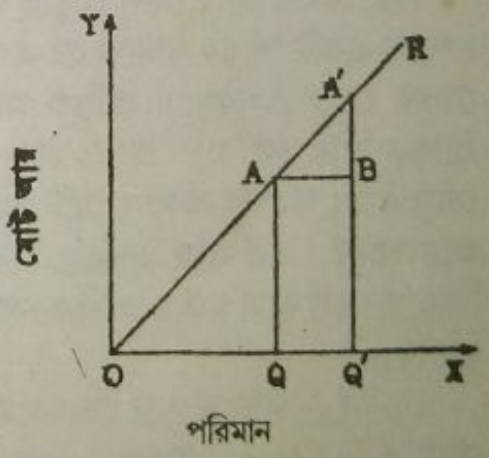

৭·১০ রেখাচিত্র : মোট আয় রেখা থেকে গড় ও প্রান্তিক আয় নিরূপন।

■ ২.৭. দাম নিয়ন্ত্রণ (Controls on Prices)

পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার বাজারে চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে দ্রব্যের দাম নির্ধারণ হয়ে থাকে। কিন্তু চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে যে দাম নির্ধারিত হয় তা সমাজের দিক দিয়ে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। ফলে দেশের সরকার ক্রেতা ও বিক্রেতাদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য দ্রব্যের সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন দাম বেঁধে দিতে পারে। **সরকার কর্তৃক কোনো দ্রব্যের সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন দাম নির্ধারণ করে দেওয়াকেই বলা হয় দাম নিয়ন্ত্রণ।**

কী কী পরিস্থিতিতে সরকার দ্রব্যের দাম নির্ধারণ করে থাকে তা উল্লেখ করা হল। **কোন্ কোন্ পরিস্থিতিতে সরকার একটি দ্রব্যের সর্বনিম্ন দাম নির্ধারণ করে দেয় তা প্রথমে আলোচনা করা হচ্ছে।** কোনো দ্রব্যের যোগান খুব বেড়ে গেলে বা চাহিদা খুব কমে গেলে বা দুটি কারণেই দ্রব্যটির দাম খুব কমে যেতে পারে। এই অবস্থায় উৎপাদক বা বিক্রেতাদের ক্ষতি হতে পারে। কৃষিজাত দ্রব্য যেমন—কাঁচা পাট, তুলো, ধান প্রভৃতি দ্রব্যের ক্ষেত্রেও যেমন এটি হতে পারে, আবার শিল্পজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রেও এটি হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে সরকার দ্রব্যের সর্বনিম্ন দাম বেঁধে দিয়ে উৎপাদক বা বিক্রেতাদের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে। সুতরাং সরকার বিক্রেতাদের স্বার্থরক্ষার জন্য দ্রব্যের সর্বনিম্ন দাম বেঁধে দিতে পারে। বিষয়টি ২.৪১ নং চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে।

২.৪১ নং চিত্রে অনুভূমিক অক্ষে চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ এবং উল্লম্ব অক্ষে দাম পরিমাপ করা হচ্ছে। চিত্রে DD_1 হল বাজার চাহিদা রেখা এবং SS_1 হল বাজার যোগান রেখা। এই দুই রেখা পরস্পর পরস্পরকে E_1 বিন্দুতে ছেদ করেছে। এই E_1 বিন্দুকে বলা হয় ভারসাম্যের বিন্দু।

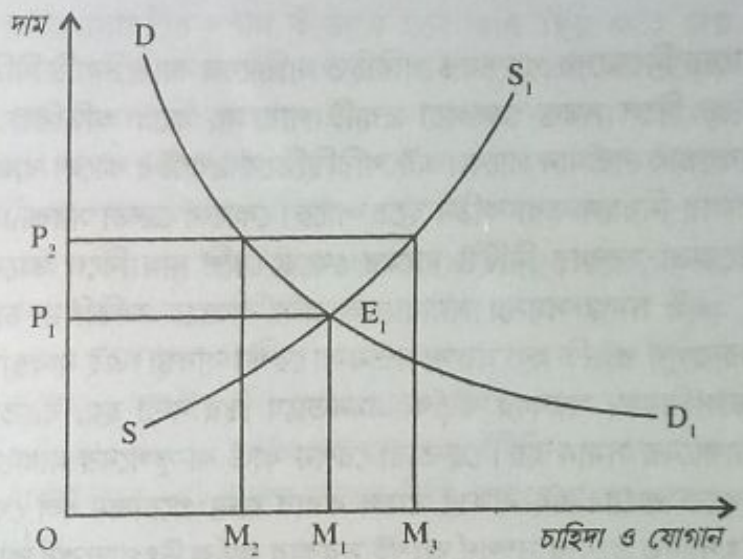

চিত্র : ২.৪১

এখানে ভারসাম্য দাম বা বাজার দাম হল OP_1, কারণ এই দামেই বাজারে চাহিদা ও যোগান সমান হচ্ছে। OM_1 হল ভারসাম্যে দ্রব্য কেনা-বেচার পরিমাণ। অর্থাৎ বাজারে যদি কোনো রকমের নিয়ন্ত্রণ না থাকে তাহলে বাজার দাম হবে OP_1। কিন্তু ধরা হচ্ছে, বাজার দাম OP_1 হলে ফার্ম বা উৎপাদকের উৎপাদন ব্যয় উঠে না আসায় ক্ষতি হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে সরকার উৎপাদকদের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বাজার দামকে OP_1 পর্যন্ত নামতে না দিয়ে OP_1 অপেক্ষা বেশি দামে দ্রব্যটির সর্বনিম্ন দাম বেঁধে দিতে পারে। ধরা হচ্ছে, সরকার সর্বনিম্ন দাম OP_2 স্তরে বেঁধে দিল। চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে, OP_2 দামে দ্রব্যটির যোগান OM_2, কিন্তু দ্রব্যটির চাহিদা হল OM_3। অর্থাৎ বাজারে অতিরিক্ত যোগান হল M_2M_3। ফলে দ্রব্যটির দাম কমার প্রবণতা থাকায় এই পরিস্থিতিতে নিম্নতম দাম OP_2 বজায় রাখা সম্ভব হবে, যদি সরকার বাজারের অতিরিক্ত যোগান M_2M_3 সমস্তই OP_2 দামে কিনে নেয়। সরকার এই M_2M_3 পরিমাণ দ্রব্যটি কিনে নিয়ে বিদেশে রপ্তানি করতে পারে বা ভবিষ্যতে চাহিদা বাড়লে যোগান বাড়ানোর জন্য গুদামে জমা রাখতে পারে, বা ঐ পরিমাণ দ্রব্য ধ্বংস করে দিতে পারে বেঁধে দেওয়া সর্বনিম্ন দাম বজায় রাখার জন্য।

কোন্ কোন্ পরিস্থিতিতে সরকার একটি দ্রব্যের সর্বোচ্চ দাম বেঁধে দেয় তা এখন আলোচনা করা হচ্ছে। কোনো দ্রব্যের যোগান খুব কমে গেলে বা চাহিদা খুব বেড়ে গেলে বা এই দুটি কারণেই দ্রব্যটির দাম খুব বেড়ে যেতে পারে। এই অবস্থায় ঐ দ্রব্যের বহু ক্রেতার বিশেষ করে দরিদ্র ক্রেতাদের অসুবিধা হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে সরকার ক্রেতাদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য দ্রব্যটির সর্বোচ্চ দাম বেঁধে দিতে পারে। সুতরাং সরকার ক্রেতাদের স্বার্থরক্ষার জন্য দ্রব্যের সর্বোচ্চ দাম বেঁধে দেয়। বিষয়টি ২.৪২ নং চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে।

২.৪২ নং চিত্রে DD_1 বাজার চাহিদা রেখা SS_1 বাজার যোগান রেখাকে E_1 বিন্দুতে ছেদ করায় ঐ বিন্দু হল ভারসাম্যের বিন্দু। এখানে ভারসাম্য দাম বা বাজার দাম হল OP_1 এবং OM_1 হল ভারসাম্য দ্রব্য কেনা-বেচার পরিমাণ। অর্থাৎ বাজারে যদি কোনো রকমের নিয়ন্ত্রণ না থাকে তাহলে বাজারে দাম হবে OP_1। ধরা

হচ্ছে বাজার দাম OP_1 খুব বেশি এবং এই দামে দেশের সাধারণ ক্রেতাদের অসুবিধা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে সরকার ক্রেতাদের অসুবিধার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বাজার দামকে OP_1 পর্যন্ত বাড়তে না দিয়ে OP_1 অপেক্ষা কম দামে দ্রব্যটির সর্বোচ্চ দাম বেঁধে দিতে পারে। ধরা হচ্ছে সরকার সর্বোচ্চ দাম OP_2 স্তরে বেঁধে দিল। চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে OP_2 দামে দ্রব্যটির চাহিদা হল OM_2, কিন্তু দ্রব্যটির যোগান হল OM_1, অর্থাৎ বাজারে অতিরিক্ত চাহিদা হল M_1M_2। অর্থাৎ বাজারে দ্রব্যটির অভাব থাকবে M_1M_2 পরিমাণ। এই পরিস্থিতিতে দ্রব্যটির বণ্টন সরকার যদি বিক্রেতাদের উপর ছেড়ে দেয়, তাহলে বিক্রেতারা বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে দ্রব্যটির বিক্রির জন্য। বিক্রেতারা 'যারা আগে আসবে, তারা আগে পাবে' এই নীতির ভিত্তিতে দ্রব্যটি বিক্রি করতে পারে। অথবা বিক্রেতারা তাদের নিজেদের পছন্দমত পরিচিত ব্যক্তিদের কাছে দ্রব্যটি বিক্রি করতে পারে। কিন্তু বিক্রেতাদের হাতে বিষয়টি ছেড়ে দিলে সমস্ত ক্রেতারা দ্রব্যটি পায় না, ফলে অতিরিক্ত চাহিদার সমস্যা থেকেই যায় এবং দাম বাড়ার প্রবণতাও বর্তমান থাকে। এই পরিস্থিতিতে দ্রব্যটির কালো বাজার সৃষ্টি হতে পারে এবং সরকারের পক্ষে কালো বাজার নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হতে পারে। কোনো ক্রেতা সরকার নির্দিষ্ট দামের চেয়ে বেশি দাম দিলে বা কোনো বিক্রেতা সরকার নির্দিষ্ট দামের থেকে বেশি দাম নিলে তাকেই বলে বে-আইনী বাজার বা কালো বাজার।

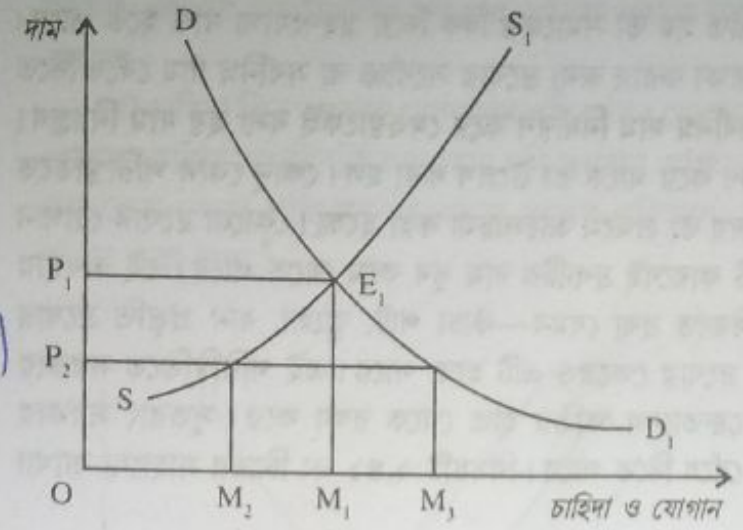

চিত্র : ২.৪২

এই সমস্ত সমস্যা সমাধানের জন্য বাজারে অতিরিক্ত চাহিদা দূর করা উচিত। এই ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হল বরাদ্দ বণ্টন বা রেশন ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় রেশন কার্ড বা কুপনের মাধ্যমে প্রতিটি ক্রেতার ভোগ বরাদ্দ সরকার কর্তৃক এমনভাবে স্থির করা হয়, যাতে দ্রব্যটির মোট বরাদ্দের পরিমাণ দ্রব্যটির মোট যোগানের সমান হয়। ক্রেতারা রেশন কার্ড বা কুপনের মাধ্যমে ন্যায্য মূল্যের দোকান থেকে দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করতে পারে। এই ব্যবস্থা সফল করার জন্য প্রয়োজন হল খোলা বাজারে দ্রব্যটির কেনা-বেচা বন্ধ করা এবং উৎপাদিত দ্রব্যের সম্পূর্ণ অংশই সরকার কর্তৃক উৎপাদকের কাছ থেকে সংগ্রহ করা। এই জন্যই অনেকে অভিমত প্রকাশ করেন যে, বরাদ্দ ব্যবস্থা বা ভোগ বরাদ্দ ব্যবস্থা ছাড়া দাম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সফল করা সম্ভব নয়।

■ ২.৮. দামব্যবস্থার কার্যপদ্ধতি এবং সম্পদ বণ্টন বা দাম কিভাবে সম্পদের বণ্টন ঘটায় (Working of Price Mechanism and Resource Allocation or How Price Allocate Resources)

বাজারে কোনো নিয়ন্ত্রণ ছাড়া চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে বিভিন্ন দ্রব্য ও সেবার (Goods and Services) এবং উৎপাদনের উপাদানসমূহের (Factors of production) দাম নির্ধারিত হয়ে যে ব্যবস্থার উদ্ভব হয়, তাকে বলে **দামব্যবস্থা**।

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় অর্থনীতির মৌলিক সমস্যাগুলির সমাধান করে সম্পদসমূহের বণ্টনের ব্যবস্থা করে দামব্যবস্থা। দামব্যবস্থার মাধ্যমে কীভাবে সম্পদসমূহ বণ্টন হয়, তা আলোচনা করা হচ্ছে।

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় কী পরিমাণে এবং কী কী উৎপাদন করতে হবে, তা স্থির করতে হলে প্রধানত নির্ধারণ করতে হয় ক্রেতাদের অসংখ্য অভাবের মধ্যে কোন্‌গুলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং তার কতখানি পূরণ করা দরকার। ক্রেতারা কোন্ দ্রব্যকে কী পরিমাণ গুরুত্ব দিচ্ছে তা প্রকাশ পায় দ্রব্যটির জন্য ক্রেতারা কী পরিমাণ দাম দিতে রাজি আছে তার উপর। যে দ্রব্যের জন্য ক্রেতারা বেশি দাম দিতে রাজি থাকে সেই দ্রব্য ক্রেতাদের কাছে বেশি পছন্দের। অপরপক্ষে যে দ্রব্যের জন্য ক্রেতারা কম দাম দিতে রাজি থাকে, সেই দ্রব্য ক্রেতাদের কাছে কম পছন্দের। এইভাবে বিভিন্ন দ্রব্যের চাহিদা ক্রেতাদের কী পরিমাণের, তা দামব্যবস্থার মাধ্যমে জানা যায় এবং উৎপাদকরা ক্রেতাদের চাহিদা মতো দ্রব্য উৎপাদন করে থাকে।

কী দ্রব্য এবং কী পরিমাণে উৎপাদন করতে হবে তা স্থির হলে, কীভাবে বা কী উপায়ে ওই সমস্ত দ্রব্যগুলি উৎপাদন করা হবে, তা ঠিক করতে হয়। অর্থাৎ উৎপাদন পদ্ধতি ঠিক করতে হয়। কোন্ উৎপাদন পদ্ধতি উৎপাদকরা গ্রহণ করবে তা ঠিক করতেও দামব্যবস্থার ভূমিকা আছে। যখন কোনো দ্রব্য উৎপাদনের অনেকগুলো উৎপাদন পদ্ধতি থাকে, তখন উৎপাদক সেই পদ্ধতি গ্রহণ করবে যাতে উৎপাদন ব্যয় সবচেয়ে কম হয়। সুতরাং উৎপাদক উৎপাদন ব্যয় কমাবার জন্য যে উপাদানের দাম বেশি, তার ব্যবহার কমিয়ে যে উপাদানের দাম কম তা বেশি পরিমাণ ব্যবহার করবে। উপাদানগুলি কী অনুপাতে ব্যবহার করলে উৎপাদন ব্যয় সর্বাপেক্ষা কম হবে, তা নির্ভর করে উপাদানগুলির দামের উপর। এইভাবে দামব্যবস্থার মাধ্যমে সার্থক উৎপাদন পদ্ধতি ব্যবহারের প্রবণতা থাকে। 50

আবার দামব্যবস্থার মাধ্যমে উপাদানের নিয়োগ বিন্যাস ঘটে থাকে। যেমন যে সমস্ত ফার্ম বেশি মুনাফা অর্জন করে, তারা বেশি দাম দিয়ে উপাদান কিনতে পারে। কিন্তু যে সমস্ত ফার্মের মুনাফা কম বা ক্ষতি হয়, তারা বেশি দাম দিয়ে উপাদান কিনতে পারে না। উপাদানের মালিকরাও সবসময় চেষ্টা করে তাদের উপাদান বেশি দামে বিক্রি করতে। ফলে উপাদানগুলি কম মুনাফা অর্জনকারী ফার্মের কাছ থেকে বেশি মুনাফা অর্জনকারী ফার্মের কাছে নিযুক্ত হয়। এইভাবে দামব্যবস্থার মাধ্যমে উপাদানের সঠিক বিন্যাস ঘটে থাকে।

ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় কী কী দ্রব্য, কী পরিমাণে উৎপাদন করতে হবে এবং ঐ দ্রব্যগুলি উৎপাদনের জন্য কোন্ পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে, তা স্থির হওয়ার পর দ্রব্যসামগ্রীর বণ্টন কীভাবে হবে তাও স্থির করে দেয় দামব্যবস্থা। উৎপাদিত দ্রব্যের বণ্টন মূলত নির্ভর করে ব্যক্তিগত আয়ের বণ্টনের উপর। যেমন, ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় কোনো দ্রব্যের যোগান যদি কম থাকে, তাহলে সেই সীমাবদ্ধ যোগানকে ক্রেতাদের মধ্যে বণ্টনের দায়িত্ব নেয় দামব্যবস্থা। দ্রব্যের যোগানে ঘাটতি থাকলে সাধারণভাবে দাম বাড়ে, ফলে সকল ক্রেতারই চাহিদার পরিমাণ কিছুটা কমে। দাম সেই পর্যন্ত বাড়তে পারে, যে দামে দ্রব্যের চাহিদা ও যোগান সমান হয়।

সুতরাং, ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সমর্থকদের মতে এই দামব্যবস্থা অর্থনীতির কাজকর্মকে নিয়ন্ত্রণ করে দেশের সম্পদসমূহ দক্ষতার সঙ্গে বণ্টন করে থাকে। এই দামব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতিটি ক্ষেত্রে চাহিদা ও যোগানের মধ্যে প্রয়োজনীয় ভারসাম্য স্থাপিত হয় এবং সেটি বজায় থাকে। ক্রেতারা সর্বনিম্ন দামে দ্রব্য ও সেবা পেয়ে থাকে, উপাদানের মালিক উপাদানগুলির সঠিক দাম (খাজনা, মজুরি, সুদ ইত্যাদি) পেয়ে থাকে, উৎপাদকরা স্বাভাবিক মুনাফা পেয়ে থাকে। এইভাবে এক অদৃশ্য হাত (an invisible hand), অর্থাৎ দামব্যবস্থা অর্থনীতির কাজকর্মকে নিয়ন্ত্রণ করে দেশের সম্পদসমূহের যথাযথ বণ্টনের ব্যবস্থা করে। এই অদৃশ্য হাতের নীতি প্রথম ঘোষণা করেন অর্থনীতি শাস্ত্রের জনক অ্যাডাম স্মিথ (*Adam Smith*)।

● **২.৮.১. দামব্যবস্থার ত্রুটি (Defects of the Price Mechanism) ঃ** বাজারে কোনো নিয়ন্ত্রণ ছাড়া চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে বিভিন্ন দ্রব্য ও সেবার এবং উৎপাদনের উপাদানসমূহের দাম নির্ধারিত হয়ে যে ব্যবস্থার উদ্ভব হয়, তাকে বলে **দামব্যবস্থা**।

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় অর্থনীতির মৌলিক সমস্যাগুলোর সমাধান করে সম্পদসমূহের বণ্টনের ব্যবস্থা করে দামব্যবস্থা। দামব্যবস্থায় দুর্লভ অর্থনৈতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার হয় বলে দাবি করা হয়ে থাকে। আবার অর্থনৈতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার হয় বলেই সামাজিক দক্ষতা অর্জন সম্ভব হয় এবং সামাজিক কল্যাণও সর্বাধিক হয় বলে দাবি করা হয়। কিন্তু **বাস্তবে এমন কতকগুলো অবস্থার সৃষ্টি হয়, যাতে দামব্যবস্থায় অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নষ্ট হয় এবং দুর্লভ অর্থনৈতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার সম্ভব হয় না। এই পরিস্থিতিকেই বলা হয় দামব্যবস্থার বা বাজারব্যবস্থার ব্যর্থতা বা দামব্যবস্থার ত্রুটি।** দামব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটিগুলি উল্লেখ করা হল ঃ

(১) সরকারি দ্রব্যের উপস্থিতি (Existence of Public Goods) ঃ বাস্তবে এমন কতকগুলি দ্রব্য আছে যেগুলি শুধুমাত্র একজনকে সরবরাহ করা সম্ভব নয়। তাই একজনকে সরবরাহ করতে হলে সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিদেরও সরবরাহ করতে হয়। এই সমস্ত দ্রব্যকেই বলা হয় সরকারি দ্রব্য। সরকারি দ্রব্যের উদাহরণ হল প্রতিরক্ষা, দূষণ নিয়ন্ত্রণ, রাস্তা আলোকিতকরণ ইত্যাদি। এই সমস্ত দ্রব্যের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ব্যক্তি এই সমস্ত দ্রব্যের সুবিধা ভোগ করলেও অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রয়োজন হয় না। তাই দামব্যবস্থার মাধ্যমে এই সমস্ত দ্রব্য সরবরাহ সম্ভব হয় না। সেই জন্যই বলা যায় সরকারি দ্রব্যের উপস্থিতি দাম ব্যবস্থার একটি ব্যর্থতা।

(২) বাহ্যিকতার উপস্থিতি (Existence of Externalities) ঃ বাজার ব্যবস্থায় আবার বাহ্যিকতার সৃষ্টি হয়। কোনো ব্যক্তির অর্থনৈতিক কাজকর্মের দ্বারা অপর ব্যক্তির কাজকর্ম যখন প্রভাবিত হয়, যদিও প্রথম

ব্যক্তির সঙ্গে অন্য ব্যক্তির কাজকর্ম যুক্ত নয়, তখন তাকে বলে বাহ্যিকতা। বাহ্যিকতা দুই ধরনের হয়ে থাকে। একটি হল ধনাত্মক বাহ্যিকতা এবং অপরটি হল ঋণাত্মক বাহ্যিকতা। বাজার লেনদেনের ফলে ক্রেতা ও বিক্রেতা ছাড়া যদি কোনো তৃতীয় ব্যক্তি সুবিধা পেয়ে থাকেন তাহলে তাকে বলে **ধনাত্মক বাহ্যিকতা**। যেমন, পশ্চিমবঙ্গে হলদিয়ায় শিল্প অঞ্চল গড়ে ওঠার ফলে ঐ অঞ্চলের জনসাধারণের রাস্তাঘাট, যোগাযোগ ইত্যাদির সুবিধা ভোগ হল ধনাত্মক বাহ্যিকতা। আবার বাজার লেনদেনের ফলে ক্রেতা ও বিক্রেতা ছাড়া যদি কোনো তৃতীয় ব্যক্তি এই লেনদেনের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে তাকে বলে **ঋণাত্মক বাহ্যিকতা**। যেমন, হলদিয়া শিল্পাঞ্চলে পরিবেশ দূষণ। দামব্যবস্থার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান করা যায় না। সরকারি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে (ভর্তুকি প্রদান করে বা কর বসিয়ে) এই সমস্যার সমাধান সম্ভব। এটি দামব্যবস্থার একটি ত্রুটি।

(৩) **স্বাভাবিক একচেটিয়ার উপস্থিতি (Existence of Natural Monopoly)** ঃ আয়তনজনিত ব্যয়-সংক্ষেপ বা আয়তনজনিত ব্যয়-সংকোচের ফলে একটি প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একক পিছু উৎপাদন ব্যয় যদি ক্রমশ কমতে থাকে, তাহলে প্রতিষ্ঠানটি কিছুদিনের মধ্যেই সমগ্র বাজারে নিজের দখল প্রতিষ্ঠা করে স্বাভাবিক একচেটিয়ায় পরিণত হয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে বাজারে কোনো প্রতিযোগিতা না থাকার ফলে প্রতিষ্ঠানটি নিজের ইচ্ছামতো দাম ধার্য করে। এটিও দামব্যবস্থার একটি ব্যর্থতা।

(৪) **উৎপাদনের ক্ষেত্রে দক্ষতার অভাব (Lack of Production Efficiency)** ঃ বাজার ব্যবস্থায় উৎপাদক উৎপাদন ব্যয় কমাবার জন্য যে উপাদানের দাম কম তা বেশি পরিমাণে ব্যবহার করে। কিন্তু কম দামের উপাদান ব্যবহার হলেই যে উপাদানের সঠিক বণ্টন ও ব্যবহার হবে, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। যেমন ভারতের মতো দেশে শ্রমিকের যোগান বেশি হওয়ার জন্য মজুরির হার কম। ফলে কম মজুরিতে বেশি পরিমাণে শ্রমিক ব্যবহার করাই উচিত। কিন্তু কম মজুরিতে যে শ্রমিক পাওয়া যায়, তা সাধারণত অ-দক্ষ হয়। অদক্ষ শ্রমিকের দ্বারা উৎপাদনের ক্ষেত্রে দক্ষতা বজায় রাখার বিষয়টি দামব্যবস্থার একটি সমস্যা।

(৫) **অনুৎপাদক শ্রেণীর উপস্থিতি (Existence of Unproductive Group)** ঃ বাজার ব্যবস্থায় ফাটকা কারবারী, মহাজন, খাজনাভোগী জমির মালিক বাজারের অস্থিরতার সুযোগে যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ উপার্জন করে থাকে। এই শ্রেণী উৎপাদনে তেমন ভূমিকা পালন না করেও যথেষ্ট প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এটি সুস্থতার লক্ষণ নয়। সুতরাং অনুৎপাদক শ্রেণীর উপস্থিতি বাজার অর্থব্যবস্থার আর এক ত্রুটি।

(৬) **আয়বৈষম্য (Inequality of Income)** ঃ বাজার ব্যবস্থায় ধনী ব্যক্তি আরও ধনী হয় এবং দরিদ্র ব্যক্তি আরও দরিদ্র হয়, কারণ বাজার ব্যবস্থায় মূলধনের মালিক বেশি অর্থ উপার্জন করে থাকে, অথচ শ্রমিক উৎপাদনে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়।

(৭) **সামাজিক কল্যাণ অবহেলিত (Negligence of Social Welfare)** ঃ বাজার ব্যবস্থায় অর্থই সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ করে। উৎপাদক সেই সমস্ত দ্রব্যই উৎপাদন করে যাতে মুনাফা আছে। যে সমস্ত দ্রব্য উৎপাদনে মুনাফা নেই, সেগুলি সমাজের জন্য যতই প্রয়োজনীয় হোক না কেন, তা উৎপাদকরা উৎপাদন করে না। অর্থাৎ বাজার ব্যবস্থায় সামাজিক কল্যাণের বিষয়টি গুরুত্ব না দিয়ে অবহেলা করা হয়। এটিও বাজার ব্যবস্থার এক ত্রুটি।

দামব্যবস্থার এই সমস্ত ত্রুটির জন্যই বর্তমানে কিন্তু অবাধ ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার দৃষ্টান্ত খুবই কম। এর পরিবর্তে অবস্থান করছে নিয়ন্ত্রিত ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা। ফলে দামব্যবস্থার কার্যকারিতাও কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। তাই বর্তমানে দেখা যাচ্ছে উৎপাদকরা দ্রব্যের দামকে, শ্রমিক সংঘ মজুরিকে, মূলধনের মালিক সুদকে প্রভাবিত করছে। বর্তমানে সরকারও দাম নিয়ন্ত্রণ করে বরাদ্দের (rationing) ব্যবস্থা করছে। এই সমস্ত কারণে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থাতেও দামব্যবস্থার কার্যকারিতা কিছুটা কমেছে।

■ ২.৯. চাহিদা-যোগান আলোচনায় করের প্রভাব—কর ও করের ব্যয় (Impact of Taxes in the Analysis of Demand-Supply—Tax and Cost of Taxation)

সরকার দ্রব্যের উপর কর আরোপ করার ফলে দ্রব্যটির দাম ও উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তিত হয়। সরকার যদি দ্রব্যটির উপর একক পিছু কর ধার্য করে বা নির্দিষ্ট পরিমাণ কর ধার্য করে তাহলে করের প্রভাবে দাম কি পরিমাণ পরিবর্তিত হবে তা নির্ভর করে চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর। বিষয়টি চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। এই অংশের প্রতিটি চিত্রেই অনুভূমিক অক্ষে চাহিদা ও যোগান এবং উল্লম্ব অক্ষে দাম পরিমাপ করা হচ্ছে। প্রতিটি চিত্রেই (চিত্র ২.৪৩, চিত্র ২.৪৪ এবং চিত্র ২.৪৫) SS_1 হল কর আরোপের

পূর্বের যোগান রেখা এবং SS_2 হল কর আরোপের পরের যোগান রেখা এবং DD_1 হল প্রতিটি ক্ষেত্রেই চাহিদা রেখা। কর আরোপের ফলে যোগান রেখাটি সমান্তরালভাবে বামদিকে স্থান পরিবর্তন করে কারণ একক পিছু বা নির্দিষ্ট পরিমাণ কর ধার্য করা হয়েছে। এই দুই যোগান রেখার উল্লম্ব দূরত্বই হল একক পিছু বা নির্দিষ্ট করের পরিমাণ।

যোগানের বিভিন্ন স্থিতিস্থাপকতায় ভারসাম্য দামের উপর করের প্রভাব ২.৪৩, ২.৪৪ ও ২.৪৫ নং চিত্রে দেখানো হয়েছে।

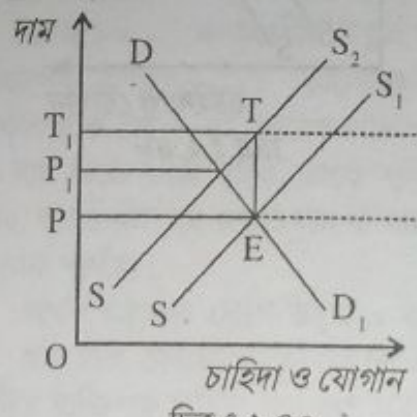

চিত্র ঃ ২.৪৩

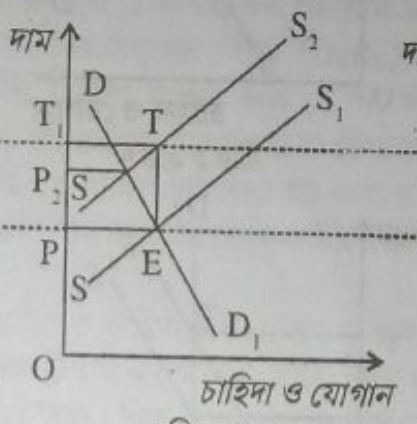

চিত্র ঃ ২.৪৪

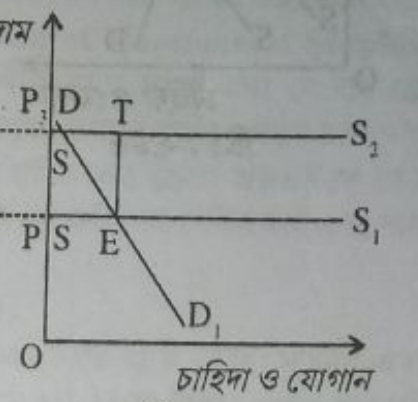

চিত্র ঃ ২.৪৫

২.৪৩, ২.৪৪ ও ২.৪৫ নং চিত্রের প্রতিটি ক্ষেত্রেই DD_1 এবং SS_1 রেখা পরস্পর পরস্পরকে E বিন্দুতে ছেদ করেছে। ফলে কর আরোপের পূর্বে ভারসাম্য দাম হল OP। কর আরোপের ফলে যোগান রেখাটি করের পরিমাণ ET দূরত্বে বামদিকে সমান্তরালভাবে সরে গেছে। কর আরোপের ফলে ভারসাম্য দাম প্রতিটি ক্ষেত্রেই বেড়েছে।

চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে ২.৪৩ নং চিত্রের SS_1 রেখা ২.৪৪ নং চিত্রের SS_1 রেখা অপেক্ষা বেশি খাড়া অর্থাৎ ২.৪৩ নং চিত্রের SS_1 রেখার স্থিতিস্থাপকতা ২.৪৪ নং চিত্রের SS_1 রেখার স্থিতিস্থাপকতা অপেক্ষা কম। চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে ২.৪৩ নং চিত্রের ভারসাম্য দাম OP থেকে বেড়ে OP_1 হয়েছে এবং ২.৪৪ নং চিত্রে ভারসাম্য দাম OP থেকে বেড়ে OP_2 হয়েছে। চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে $OP_2 > OP_1$ অর্থাৎ যোগানের স্থিতিস্থাপকতা যত বেশি হবে ভারসাম্য দাম তত বেশি বাড়বে। ২.৪৩ নং চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে ET ($=PT_1$) পরিমাণ করের মধ্যে ক্রেতাদের উপর করের বোঝা বা করের ব্যয় হল PP_1 এবং বিক্রেতাদের উপর করের বোঝা বা করের ব্যয় হল $(PT_1 - PP_1)$ P_1T_1। আবার ২.৪৪ নং চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে ET ($=PT_1$) পরিমাণ করের মধ্যে ক্রেতাদের উপর করের বোঝা বা করের ব্যয় হল PP_2 এবং বিক্রেতাদের উপর করের বোঝা বা করের ব্যয় হল $(PT_1 - PP_2)$ P_2T_1। চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে ২.৪৩ নং চিত্রে ক্রেতাদের উপর করের বোঝা বা করের ব্যয় PP_1, ২.৪৪ নং চিত্রে ক্রেতাদের উপর করের বোঝা বা করের ব্যয় PP_2 অপেক্ষা কম ($PP_1 < PP_2$) এবং বিক্রেতাদের উপর করের বোঝা বা করের ব্যয় বেশি ($P_1T_1 > P_2T_1$)।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে কর আরোপের ফলে **করের বোঝা বা করের ব্যয় ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে বিভক্ত হয়। যোগানের স্থিতিস্থাপকতা যত বাড়বে ততই ক্রেতাদের উপর করের বোঝার বা করের ব্যয়ের অংশ বাড়বে ($PP_2 > PP_1$) এবং বিক্রেতাদের উপর করের বোঝার বা করের ব্যয়ের অংশ কমবে ($P_2T_1 < P_1T_1$)।**

২.৪৫ নং চিত্রে SS_1 হল সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক যোগান রেখা। এখানে কর আরোপের ফলে ভারসাম্য দাম OP থেকে বেড়ে OP_3 হয়েছে। ফলে ভারসাম্য দাম বেড়েছে PP_3 যেটি আবার করের পরিমাণের ET-র সাথে সমান ($PP_3 = ET$) অর্থাৎ করের বোঝার বা করের ব্যয়ের সম্পূর্ণ অংশই ক্রেতাদের উপর পড়ে বিক্রেতারা করের কোনো বোঝা বা করের ব্যয় বহন করে না।

সুতরাং **যোগানের স্থিতিস্থাপকতা যত বাড়বে ক্রেতাদের উপর করের বোঝা বা করের ব্যয় তত বাড়বে এবং বিক্রেতাদের উপর করের বোঝা বা করের ব্যয় কমবে।**

চাহিদার বিভিন্ন স্থিতিস্থাপকতার ভারসাম্য দামের উপর করের প্রভাব ২.৪৬, ২.৪৭, ২.৪৮ এবং ২.৪৯ নং চিত্রে দেখানো হয়েছে।

২.৪৬, ২.৪৭, ২.৪৮ এবং ২.৪৯ নং চিত্রে প্রতি ক্ষেত্রেই DD_1 এবং SS_1 রেখা পরস্পর পরস্পরকে E বিন্দুতে ছেদ করেছে। ফলে কর আরোপের পূর্বে ভারসাম্য দাম হল OP। কর আরোপের ফলে যোগান রেখাটি করের পরিমাণ ET দূরত্বে বামদিকে সমান্তরালভাবে সরে SS_2 হয়েছে। ফলে ভারসাম্য দামের পরিবর্তন ব্যাখ্যা করা হচ্ছে।

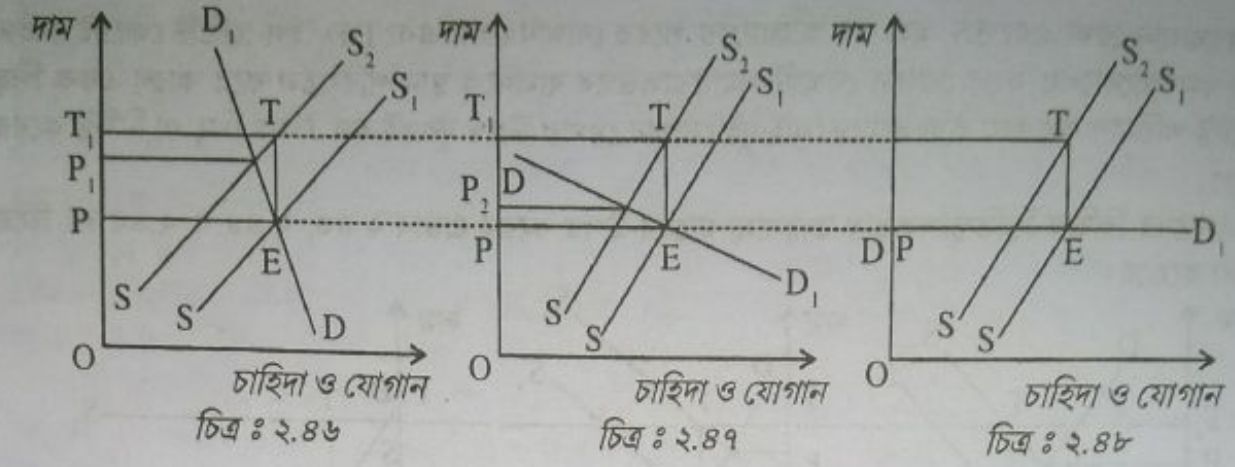

চিত্র ঃ ২.৪৬ চিত্র ঃ ২.৪৭ চিত্র ঃ ২.৪৮

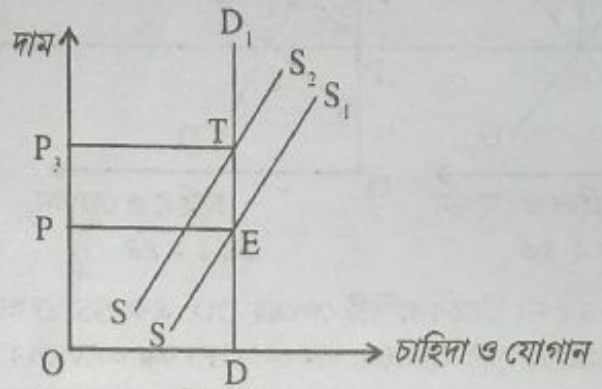

চিত্র ঃ ২.৪৯

চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে ২.৪৬ নং চিত্রের চাহিদা রেখা DD_1 ২.৪৭ নং চিত্রের চাহিদা রেখা অপেক্ষা বেশি খাড়াই। অর্থাৎ ২.৪৬ নং চিত্রে DD_1 রেখার স্থিতিস্থাপকতা ২.৪৭ নং চিত্রের DD_1 রেখার স্থিতিস্থাপকতা অপেক্ষা কম।

চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে ২.৪৬ নং চিত্রের ভারসাম্য দাম OP থেকে বেড়ে OP_1 হয়েছে এবং ২.৪৭ নং চিত্রে ভারসাম্য দাম OP থেকে বেড়ে OP_2 হয়েছে। চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে $OP_2 < OP_1$ অর্থাৎ চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা যত বেশি হবে ভারসাম্য দাম তত কম বাড়বে। ২.৪৬ নং চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে ET (=PT_1) পরিমাণ করের মধ্যে ক্রেতাদের উপর করের বোঝা বা করের ব্যয় হল PP_1 এবং বিক্রেতাদের উপর করের বোঝা বা করের ব্যয় হল ($PT_1 - PP_1$) P_1T_1। আবার ২.৪৭ নং চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে ET (=PT_1) পরিমাণ করের মধ্যে ক্রেতাদের উপর করের বোঝা বা করের ব্যয় হল PP_2 এবং বিক্রেতাদের উপর করের বোঝা বা করের ব্যয় হল ($PT_1 - PP_2$) P_2T_1। চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে ২.৪৬ নং চিত্রে ক্রেতাদের উপর করের বোঝা বা করের ব্যয় PP_1 কিন্তু ২.৪৭ নং চিত্রে ক্রেতাদের উপর করের বোঝা বা করের ব্যয় PP_2 অপেক্ষা বেশি ($PP_1 > PP_2$) এবং বিক্রেতাদের উপর করের বোঝা বা করের ব্যয় কম ($P_1T_1 < P_2T_1$)।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে কর আরোপের ফলে করের বোঝা বা করের ব্যয় ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে বিভক্ত হয়। চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা যত বাড়বে ততই ক্রেতাদের উপর করের বোঝার বা করের ব্যয়ের অংশ কমবে ($PP_2 < PP_1$) এবং বিক্রেতাদের উপর করের বোঝার বা করের ব্যয়ের অংশ বাড়বে ($P_2T_1 > P_1T_1$)।

২.৪৮ নং চিত্রে DD_1 হল সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক চাহিদা রেখা। এখানে কর আরোপের ফলে ভারসাম্য দাম OP-তে অপরিবর্তিত থাকছে। চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে ভারসাম্য দাম OP-তে অপরিবর্তিত থাকার ফলে করের বোঝার বা করের ব্যয়ের সম্পূর্ণ অংশই বিক্রেতাদের উপর পড়ে কিন্তু ক্রেতারা করের বোঝা বা করের ব্যয় বহন করে না।

২.৪৯ নং চিত্রে DD_1 হল সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক চাহিদা রেখা। এখানে কর আরোপের ফলে ভারসাম্য দাম OP থেকে বেড়ে OP_2 হয়েছে। চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে ভারসাম্য দাম বাড়ছে PP_2 পরিমাণ যেটি করের পরিমাণের (ET) সমান। ফলে করের বোঝার বা করের ব্যয়ের সম্পূর্ণ অংশই ক্রেতাদের উপর পড়ে বিক্রেতাদের করের বোঝা বা করের ব্যয় বহন করতে হয় না।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যোগান ও চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর নির্ভর করে বিক্রেতা ও ক্রেতাদের মধ্যে করের বোঝা বা করের ব্যয় কিভাবে বন্টন হবে। যেমন যোগানের স্থিতিস্থাপকতা যত বাড়ে ক্রেতাদের উপর

করের বোঝা বা করের ব্যয় ততই বাড়ে এবং বিক্রেতাদের উপর করের বোঝা বা করের ব্যয় ততই কমতে থাকে। অপরপক্ষে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা যত বাড়ে বিক্রেতাদের উপর করের বোঝা বা করের ব্যয় ততই বাড়ে এবং ক্রেতাদের উপর করের বোঝা বা করের ব্যয় ততই কমতে থাকে।

■ ২.১০. ভোগকারীর উদ্বৃত্ত বা ভোগোদ্বৃত্ত (Consumer's Surplus)

ফরাসী অর্থনীতিবিদ্ *ডুপিট* (*Dupit*) ভোগকারীর উদ্বৃত্ত শব্দটি উদ্ভাবন করেন। অধ্যাপক মার্শাল ভোগকারীর উদ্বৃত্ত ধারণাটির সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দেন। তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক গুরুত্বের জন্য ধারণাটি ব্যাখ্যা করা হচ্ছে।

● ২.১০.১. ভোগকারীর উদ্বৃত্ত বা ভোগোদ্বৃত্তের সংজ্ঞা (Definition of Consumer's Surplus) : অধ্যাপক মার্শালের মতে কোনো ব্যক্তি কোনো দ্রব্যের জন্য যে দাম দিতে রাজি থাকে এবং যে দাম ক্রেতা প্রকৃতপক্ষে দেয়—এই দুইয়ের পার্থক্য হল ভোগকারীর উদ্বৃত্ত বা ভোগোদ্বৃত্ত। কোনো ব্যক্তি কোনো দ্রব্যের জন্য যে দাম দিতে রাজি থাকে, তাকে ব্যক্তিগত চাহিদা দাম বলা হয় এবং দ্রব্যটির জন্য ক্রেতা প্রকৃতপক্ষে যে দাম দেয়, তাকে বলা হয় প্রকৃত দাম বা বাজার দাম। সুতরাং ভোগকারীর উদ্বৃত্ত হল ব্যক্তিগত চাহিদা দাম এবং বাজার দামের পার্থক্য।

অর্থাৎ ক্রেতার ভোগ উদ্বৃত্ত = ব্যক্তিগত চাহিদা দাম – বাজার দাম।

ধরা যাক, কোনো ক্রেতা কোনো একটি হাতঘড়ির জন্য 2000 টাকা দাম দিতে রাজি আছে। সুতরাং এখানে ঘড়ির ব্যক্তিগত চাহিদা দাম হল 2000 টাকা। কিন্তু হাতঘড়ির প্রকৃত দাম হল 1800 টাকা। অর্থাৎ হাতঘড়ির বাজার দাম হল 1800 টাকা। সুতরাং এখানে হাতঘড়ির জন্য ক্রেতার ভোগ-উদ্বৃত্ত হল (2000 টাকা – 1800 টাকা) 200 টাকা।

● ২.১০.২. ভোগকারীর উদ্বৃত্ত বা ভোগোদ্বৃত্তের পরিমাপ (Measurement of Consumer's Surplus) : ভোগকারীর উদ্বৃত্ত পরিমাপের জন্য তালিকা ২.৮ ব্যবহার করা হচ্ছে।

তালিকা ২.৮ : ভোগোদ্বৃত্তের পরিমাপ

চায়ের পরিমাণ (পাউণ্ডে)	ব্যক্তিগত চাহিদা দাম (টাকায়)	বাজার দাম (টাকায়)	ভোগকারীর উদ্বৃত্ত (টাকায়)
1	100	50	50
2	90	50	40
3	80	50	30
4	70	50	20
5	50	50	0

উপরের ২.৮ নং তালিকায় ধরা হয়েছে, ক্রেতা চা কিনছে এবং প্রতি পাউণ্ড চায়ের বাজার দাম 50 টাকা অর্থাৎ চায়ের বাজার দাম হল 50 টাকা। তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে, ক্রেতা প্রথম পাউণ্ড চায়ের জন্য সর্বাধিক 100 টাকা দাম দিতে রাজি আছে। অর্থাৎ প্রথম পাউণ্ড চায়ের ব্যক্তিগত চাহিদা দাম হল 100 টাকা। কিন্তু প্রথম পাউণ্ড চায়ের জন্য ক্রেতার খরচ হচ্ছে 50 টাকা। সুতরাং প্রথম পাউণ্ড চা থেকে ক্রেতার বা ভোগকারীর উদ্বৃত্ত হল (100 টাকা – 50 টাকা) 50 টাকা। দ্বিতীয় পাউণ্ড চায়ের জন্য ভোগকারী সর্বাধিক 90 টাকা দাম দিতে রাজি আছে, অর্থাৎ দ্বিতীয় পাউণ্ড চায়ের ব্যক্তিগত চাহিদা দাম হল 90 টাকা। কিন্তু দ্বিতীয় পাউণ্ড চায়ের জন্য ভোগকারীর খরচ হচ্ছে 50 টাকা। সুতরাং দ্বিতীয় পাউণ্ড চা থেকে ক্রেতার বা ভোগকারীর উদ্বৃত্ত হল (90 টাকা – 50 টাকা) 40 টাকা। একইভাবে তৃতীয় পাউণ্ড চায়ের জন্য ভোগকারীর উদ্বৃত্ত হল (80 টাকা – 50 টাকা) 30 টাকা। চতুর্থ পাউণ্ড চায়ের জন্য ভোগকারীর উদ্বৃত্ত হল (70 টাকা –50 টাকা) 20 টাকা। কিন্তু পঞ্চম পাউণ্ড চায়ের জন্য ভোগকারীর উদ্বৃত্ত হল (50 টাকা – 50 টাকা) শূন্য। অর্থাৎ পঞ্চম পাউণ্ড চায়ের জন্য ক্রেতার কোনো ভোগোদ্বৃত্ত নেই। সুতরাং এখানে ক্রেতার মোট ভোগোদ্বৃত্ত হল (50 টাকা + 40 টাকা + 30 টাকা + 20 টাকা + 0 টাকা) 140 টাকা।

অন্যভাবেও ভোগকারীর উদ্বৃত্ত পরিমাপ করা যায়। উপরের তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে, ভোগকারী 5 পাউণ্ড চায়ের জন্য মোট (100 টাকা + 90 টাকা + 80 টাকা + 70 টাকা + 50 টাকা) 390 টাকা দিতে রাজি আছে। কিন্তু এই 5 পাউণ্ড চায়ের জন্য ক্রেতার খরচ হচ্ছে (50 টাকা × 5) 250 টাকা। সুতরাং এখানে ভোগকারীর মোট উদ্বৃত্ত হল (390 টাকা – 250 টাকা) 140 টাকা। সুতরাং ক্রেতার মোট ভোগোদ্বৃত্ত এইভাবেও পরিমাপ করা যায়।

ক্রেতার ভোগোদ্বৃত্তের ধারণাটি নীচের ২.৫০ নং চিত্রের সাহায্যে বোঝানো হয়েছে।

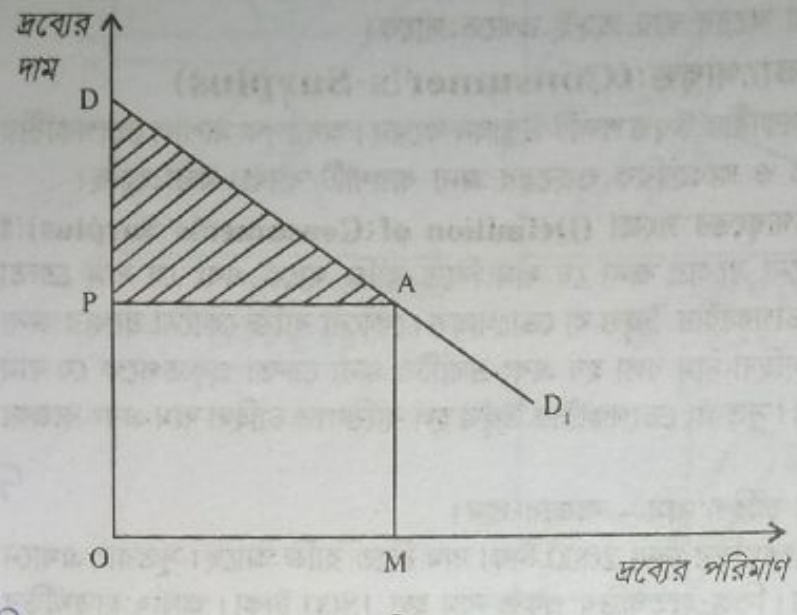

চিত্র ঃ ২.৫০

২.৫০ নং চিত্রে অনুভূমিক অক্ষে দ্রব্যের পরিমাণ এবং উল্লম্ব অক্ষে দ্রব্যের দাম পরিমাপ করা হচ্ছে। চিত্রে DD_1 হল দ্রব্যের চাহিদা রেখা। ক্রেতা যদি OM পরিমাণ দ্রব্য কেনে, তাহলে ক্রেতা এর জন্য মোট যে দাম দিতে রাজি আছে, তার পরিমাণ হল ODAM এলাকার ক্ষেত্রফল। অর্থাৎ OM পরিমাণ দ্রব্যের পরিপ্রেক্ষিতে চাহিদা রেখার নীচের এলাকার ক্ষেত্রফল। কিন্তু OM পরিমাণ দ্রব্যের জন্য প্রতি এককে বাজার দাম হল OP। সুতরাং OM পরিমাণ দ্রব্যের জন্য ক্রেতাকে মোট দাম দিতে হয় (OP × OM) OPAM ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমান। সুতরাং চিত্রে ক্রেতার ভোগ উদ্বৃত্ত হল (ODAM – OPAM) DPA ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল।

● ২.১০.৩. ভোগকারীর উদ্বৃত্ত বা ভোগোদ্বৃত্ত ধারণার গুরুত্ব অথবা ভোগোদ্বৃত্ত ধারণার ব্যবহার (Importance of the Concept of Consumer's Surplus or uses of the Concept of Consumer's Surplus) ঃ ভোগোদ্বৃত্ত ধারণাটির ব্যবহারিক গুরুত্বগুলি আলোচনা করা হচ্ছে ঃ

(১) **ব্যবহারিক মূল্য ও বিনিময় মূল্যের পার্থক্য ঃ** ভোগকারীর উদ্বৃত্ত ধারণাটি কোনো দ্রব্যের ব্যবহারিক মূল্য ও বিনিময় মূল্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, ভোগকারীর উদ্বৃত্ত ধারণার ব্যক্তিগত চাহিদা দামকে দ্রব্যটির ব্যবহারিক মূল্য এবং বাজার দামকে দ্রব্যটির বিনিময় মূল্য হিসেবে গণ্য করা যায়।

(২) **একচেটিয়া কারবারীর কাছে গুরুত্ব ঃ** একচেটিয়া বাজারে একজন মাত্র বিক্রেতা থাকায় একচেটিয়া কারবারী নিজে দ্রব্যের দাম ঠিক করে থাকে। কিন্তু একচেটিয়া কারবারী দ্রব্যের দাম ইচ্ছামতো বাড়াতে পারে না। দাম বাড়াবার সময় তাকে ক্রেতার ভোগোদ্বৃত্তের বিষয়টি ভাবতে হয়। দ্রব্যটির জন্য ক্রেতার ভোগোদ্বৃত্ত যদি বেশি থাকে, তাহলে একচেটিয়া কারবারীর পক্ষে বেশি দাম আদায় করা সম্ভব।

(৩) **জীবনযাত্রার মানের তুলনা ঃ** এই ধারণার সাহায্যে বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন ব্যক্তির অর্থনৈতিক অবস্থার তুলনা করা যায়। ভোগোদ্বৃত্তের পরিমাণ যত বেশি হবে, জীবনযাত্রার মানও তত বেশি হবে।

(৪) **লোককল্যাণ অর্থনীতিতে বা কল্যাণধর্মী অর্থনীতিতে গুরুত্ব ঃ** যে অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় জনসাধারণের কল্যাণ এবং অকল্যাণের উপর দৃষ্টি দিয়ে সামাজিক কল্যাণ সর্বোচ্চ করার চেষ্টা হয়, তাকে বলে **লোককল্যাণ অর্থনীতি বা কল্যাণকামী অর্থনীতি**। এই অর্থনীতিতে জনসাধারণের কল্যাণ পরিমাপের জন্য ক্রেতার ভোগোদ্বৃত্তের ধারণা ব্যবহার করা যায়। ক্রেতার ভোগোদ্বৃত্ত বাড়লে তার কল্যাণও বাড়বে। সুতরাং কল্যাণের মাপকাঠি হিসেবে ভোগোদ্বৃত্তের ধারণার গুরুত্ব আছে।

(৫) **আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লাভের পরিমাপ ঃ** আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থেকে কোনো দেশের কী পরিমাণ লাভ হয়, তার পরিমাপ করা যায় ভোগোদ্বৃত্ত ধারণার দ্বারা। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে দেশের জনসাধারণের ভোগোদ্বৃত্তের পরিমাণ যত বাড়তে থাকে, সেই দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থেকে লাভের পরিমাণও তত বাড়তে থাকে।

(৬) **সরকারি আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রে ঃ** সরকার কর আরোপের সময় ভোগোদ্বৃত্তের ধারণা প্রয়োগ করে থাকে। দ্রব্যের উপর কর বসালে দ্রব্যের দাম বাড়ে, ফলে একদিকে যেমন ক্রেতার ভোগোদ্বৃত্ত কমে, অপরদিকে তেমনি সরকারের আয় বাড়ে। যে কর আরোপের ফলে ভোগোদ্বৃত্তের পরিমাণ যে পরিমাণ কমে, তা অপেক্ষা যদি সরকারি আয় বেশি পরিমাণ বাড়ে, তাহলে সেই করই আরোপ করা উচিত। ঠিক একইভাবে সরকারি ভরতুকির (Subsidy) ক্ষেত্রেও এই ধারণার ব্যবহার আছে। উৎপাদকের লোকসান মেটানোর জন্য সরকার যে অর্থ সাহায্য দেয়, সেটাই হল ভরতুকি। সরকার ভরতুকি দেওয়ার ফলে ভোগোদ্বৃত্ত কী পরিমাণ বাড়ে এবং তার জন্য

সরকারের ব্যয় কতটা বাড়ে তা বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সুতরাং সরকারি আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রেও এই ধারণার প্রয়োগ দেখা যায়।

● **২.১০.৪. ভোগকারীর উদ্বৃত্ত বা ভোগোদ্বৃত্ত ধারণাটির ত্রুটি বা সীমাবদ্ধতা (Limitations of the Concept of Consumer's Surplus) ঃ** ভোগকারীর উদ্বৃত্ত ধারণাটির ব্যবহারিক ও তত্ত্বগত গুরুত্ব আছে ঠিকই, কিন্তু এই ধারণাটির কিছু সীমাবদ্ধতা বা ত্রুটি আছে। উল্লেখযোগ্য সীমাবদ্ধতাগুলি উল্লেখ করা হচ্ছে ঃ

(১) **উপযোগিতা পরিমাপের অসুবিধা ঃ** মার্শালের ভোগোদ্বৃত্ত ধারণায় ধরা হয়, উপযোগিতা সংখ্যায় প্রকাশ করা সম্ভব। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, উপযোগিতা একটি মানসিক ধারণা যা সংখ্যায় পরিমাপ করা যায় না।

(২) **অর্থের উপযোগিতা স্থির ঃ** এই ধারণায় ধরা হয় অর্থের বা টাকার প্রান্তিক উপযোগিতা স্থির আছে, কিন্তু ক্রেতা কোনো দ্রব্য বেশি পরিমাণে কিনলে বেশি অর্থ ব্যয় হয়। ফলে অর্থের প্রান্তিক উপযোগিতারও পরিবর্তন হয়। 56

(৩) **কাল্পনিক ব্যক্তিগত চাহিদা দাম ঃ** কোনো দ্রব্যের জন্য ক্রেতা সর্বাধিক কী দাম দিতে রাজি থাকে, তা বহু বিষয়ের উপর নির্ভর করে। ফলে একটি দ্রব্য থেকে প্রাপ্ত ভোগোদ্বৃত্ত বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন হতে পারে। যেমন, রাজস্থানে ঠাণ্ডা পানীয়ের ভোগোদ্বৃত্ত এবং সিমলায় ঠাণ্ডা পানীয়ের ভোগোদ্বৃত্ত আলাদা হয়ে থাকে।

(৪) **জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ঃ** জীবনধারণের জন্য অতি প্রয়োজনীয় (জীবনদায়ী ঔষধ) দ্রব্যের ব্যক্তিগত চাহিদা দাম অনেক সময় অসীম (Infinite)। অর্থাৎ এই সমস্ত দ্রব্যের জন্য ক্রেতা যে কোনো দাম দিতে রাজি থাকে। সুতরাং এখানে ভোগোদ্বৃত্ত হবে অসীম, অর্থাৎ পরিমাপ করা যাবে না।

(৫) **প্রদর্শনমূলক দ্রব্য ঃ** *অধ্যাপক টাউসিগ (Taussig)*-এর মতে প্রদর্শনমূলক দ্রব্যের (হীরা) ভোগোদ্বৃত্ত পরিমাপ করা অসম্ভব। কারণ এই সমস্ত দ্রব্যের দাম কমলে ক্রেতার কাছে তার উপযোগিতা কমে যায়। ফলে ক্রেতার ভোগোদ্বৃত্ত বাড়ার পরিবর্তে কমে যায়, যা মার্শালের ভোগোদ্বৃত্ত ধারণার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায় না।

(৬) **পরিবর্ত ও পরিপূরক দ্রব্য ঃ** পরিবর্ত দ্রব্য (যেমন, চা ও কফি) এবং পরিপূরক দ্রব্যের (যেমন, মোটরগাড়ি ও পেট্রোল) ক্ষেত্রে ভোগোদ্বৃত্ত পরিমাপের অসুবিধা আছে। কারণ পেট্রোলের ভোগোদ্বৃত্ত শুধুমাত্র পেট্রোলের চাহিদা রেখার দ্বারা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। সেই সাথে মোটরগাড়ির চাহিদা রেখাও যুক্ত করতে হয়। কিন্তু এখানে তা সম্ভব নয়।

(৭) **সমষ্টিগত বা সামাজিক ভোগোদ্বৃত্ত ঃ** সমষ্টিগত ভোগোদ্বৃত্ত পরিমাপের অসুবিধা আছে। কারণ কোনো একটি দ্রব্যের ব্যক্তিগত চাহিদা দাম বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে বিভিন্ন হয়ে থাকে, ক্রেতার আয়, রুচি ও পছন্দ ইত্যাদি আলাদা হওয়ার জন্য। ফলে এখানে সামাজিক ভোগোদ্বৃত্ত পরিমাপ করা সম্ভব নয়।

২.১১. উৎপাদকের উদ্বৃত্ত ও বাজারের দক্ষতা (Producer Surplus and the Efficiency of the Market)

উৎপাদক বা বিক্রেতা কোনো দ্রব্যের যোগান বা বিক্রির জন্য যে সর্বনিম্ন দামে যোগান দিতে রাজি থাকে এবং যে দাম বিক্রেতা প্রকৃতপক্ষে পেয়ে থাকে—এই দুইয়ের পার্থক্যকে বলে **উৎপাদকের উদ্বৃত্ত**।

যে সর্বনিম্ন দামে উৎপাদক দ্রব্যটির নির্দিষ্ট একক যোগান দিতে রাজি থাকে সেটি ওই দ্রব্যটির নির্দিষ্ট একক উৎপাদনের প্রান্তিক ব্যয়ের সমান। বিষয়টি ২.৫১ নং চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে।

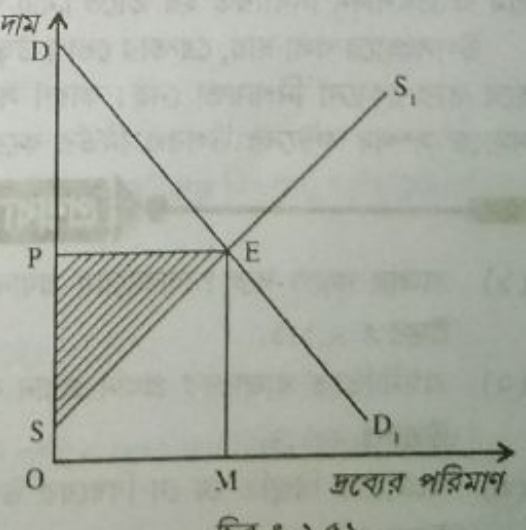

চিত্র ঃ ২.৫১

২.৫১ নং চিত্রে অনুভূমিক অক্ষে দ্রব্যের পরিমাণ এবং উল্লম্ব অক্ষে দাম পরিমাপ করা হয়েছে। চিত্রে DD_1 হল দ্রব্যটির চাহিদা রেখা এবং SS_1 হল দ্রব্যটির যোগান রেখা। এই দুই রেখা পরস্পর পরস্পরকে E বিন্দুতে ছেদ করেছে। এই E বিন্দুকে বলা হয় ভারসাম্যের বিন্দু। এখানে দ্রব্যটির ভারসাম্য দাম বা বাজার দাম হল OP এবং OM হল দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ।

চিত্রের SS_1 যোগান রেখা থেকে দেখা যাচ্ছে উৎপাদক সর্বশেষ OM পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করলে প্রান্তিক ব্যয়ের [SS_1 রেখা হল ফার্মের প্রান্তিক ব্যয় রেখা (বিশদ বিবরণের জন্য

চতুর্থ অধ্যায়ের ৪.৩.২.৯. দেখ)] ব্যয়ের সঙ্গে দ্রব্যটির বাজার দাম সমান হয়। কিন্তু SS_1 যোগান রেখা থেকে দেখা যাচ্ছে উৎপাদক শূন্য একক থেকে ক্রমাগতভাবে OM তম একক দ্রব্য বাজার দাম অপেক্ষা কম দামে যোগান দিতে রাজি আছে। বিক্রেতা যদি OM পরিমাণ দ্রব্য যোগান দেয় তাহলে বিক্রেতা সর্বনিম্ন যে দাম পেতে চায় তার পরিমাণ হল OSEM এলাকার ক্ষেত্রফল। অর্থাৎ OM পরিমাণ দ্রব্যের পরিপ্রেক্ষিতে যোগান রেখার নীচের এলাকার ক্ষেত্রফল। কিন্তু OM পরিমাণ দ্রব্যের জন্য বিক্রেতা প্রতি এককে যে দাম পায় অর্থাৎ বাজার দাম হল OP। সুতরাং OM পরিমাণ বিক্রির জন্য বিক্রেতা যে মোট বিক্রয়লব্ধ আয় পায় তার পরিমাণ হল [বাজার দাম (OP) × বিক্রির পরিমাণ (OM)] OPEM ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল।

সুতরাং উৎপাদকের উদ্বৃত্তের পরিমাণ হল (OPEM – OSEM) PSE ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল। উৎপাদক দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয়ের জন্য যে সুবিধা পায় তার পরিমাণ নির্ধারিত হয়ে থাকে উৎপাদকের উদ্বৃত্ত অর্জনের পরিমাণের মাধ্যমে।

উৎপাদকের উদ্বৃত্তের পরিপ্রেক্ষিতে বাজারের দক্ষতা সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক বৈশিষ্ট্য হল অর্থনৈতিক সম্পদের যথাযথ বণ্টনের মাধ্যমে সমাজের ব্যক্তিদের সর্বাধিক কল্যাণ অর্জনের ব্যবস্থা করা।

পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বণ্টনগত দক্ষতা অর্জন আবার ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে পারস্পরিক সুবিধাজনক দ্রব্য লেনদেন নির্দেশ করে। এর অর্থ হল বাজারে লেনদেনে অংশগ্রহণের ফলে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই লাভবান হয়। প্রকৃত অর্থে পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দ্রব্যের সর্বাধিক উৎপাদন ও বিনিময় ঘটে থাকে যেটি সর্বাধিক সামাজিক মঙ্গল সূচিত করে বা বাজারের সর্বাদিক দক্ষতা ঘটায়।

57 সর্বাধিক সামাজিক মঙ্গল বা বাজারের সর্বাধিক দক্ষতা নির্ধারণের জন্য বিক্রেতার উদ্বৃত্তের সঙ্গে ক্রেতার ভোগ উদ্বৃত্ত বিচার করা হচ্ছে। কোনো দ্রব্যের জন্য ক্রেতা যে দাম দিতে রাজি থাকে এবং প্রকৃতপক্ষে যে দাম ক্রেতা দিয়ে থাকে এই দুইয়ের পার্থক্য হল ক্রেতার ভোগ উদ্বৃত্ত (বিশদ বিবরণের জন্য ২.১০ দেখ)। OM পরিমাণ দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ে ক্রেতার ভোগ উদ্বৃত্তের পরিমাণ হল ODEM এলাকার ক্ষেত্রফল (OM পরিমাণ দ্রব্যের পরিপ্রেক্ষিতে চাহিদা রেখা DD_1 এর নীচের এলাকার ক্ষেত্রফল) থেকে OPEM [দাম (OP) × দ্রব্যের পরিমাণ (OM)] এলাকার ক্ষেত্রফলের বিয়োগের সমান অর্থাৎ ক্রেতার ভোগ উদ্বৃত্ত হল DPE (ODEM – OPEM)।

২.৫১ নং চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে OM পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয়ে ক্রেতার ভোগ উদ্বৃত্তের পরিমাণ হল DPE এলাকার ক্ষেত্রফল এবং উৎপাদকের উদ্বৃত্তের পরিমাণ বা PES এলাকার ক্ষেত্রফল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে দ্রব্য উৎপাদন ও লেনদেনের ফলে ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়েই লাভবান হচ্ছে। সমাজের দিক থেকে মোট সুবিধার পরিমাণ হল ক্রেতার ভোগ উদ্বৃত্ত ও বিক্রেতার উদ্বৃত্তের যোগফল। ক্রেতার ভোগ উদ্বৃত্ত ও বিক্রেতার উদ্বৃত্তের যোগফল (DPE + PES)-কে বলা হয় মোট অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত।

ভোগ, উৎপাদন ও দ্রব্য বিনিময়ের বণ্টনগত দক্ষতা (অর্থাৎ বাজার দক্ষতা) অর্জন হয় অর্থাৎ সর্বাধিক সামাজিক সুবিধা অর্জন হয় যখন মোট অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত (ক্রেতার ভোগ উদ্বৃত্ত + উৎপাদকের উদ্বৃত্ত) সর্বাধিক হয়। উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার বাজারে চাহিদা ও যোগান দ্বারা দ্রব্যের যে দাম ও উৎপাদন নির্ধারিত হয় তাতে মোট অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত সর্বাধিক হয় এবং বাজারে দক্ষতা বজায় থাকে।

উপসংহারে বলা যায়, ক্রেতার ভোগ উদ্বৃত্ত ও বিক্রেতার উদ্বৃত্ত সর্বাধিক হলেই যে সামাজিক কল্যাণ সর্বাধিক হবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। কারণ সামাজিক কল্যাণ ক্রেতার ভোগ উদ্বৃত্ত ও বিক্রেতার উদ্বৃত্ত ছাড়াও সমাজে সম্পদ বণ্টনের উপরও নির্ভর করে।